মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী

(পরিবর্ধিত সংস্করণ)

মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী

(পরিবর্ধিত সংস্করণ)

শিবপুর বিজয়ী সংঘ পরিচালিত শ্রীশ্রী৺দশমহাবিদ্যার মন্দিরে মায়ের অধিষ্ঠানের নানা ঘটনাবহুল কাহিনী, দশমহাবিদ্যা রূপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও অন্যান্য কাহিনী সম্বলিত এক প্রামাণ্য ইতিহাস।

শিবপুর বিজয়ী সংঘ (রেজি : এস/৯৫৯৭৪)
৬, ভূতনাথ হালদার লেন, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২

MRINMOYEE THEKE CHINMOYEE

by : **Shibpur Bijoyee Sangha** (Regd. : S/95974)

মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী

শিবপুর বিজয়ী সংঘ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © L-45 117/2012

প্রকাশক ঃ শিবপুর বিজয়ী সংঘ (রেজি : এস্ /৯৫৯৭৪)
৬, ভূতনাথ হালদার লেন, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২
চলভাষ ঃ ৯৪৩২০ ৬৪১০৪
e-mail : shibpurbijoyeesangha@gmail.com
website: http://www.dashmahavidyatemple.in

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৭শে অক্টোবর, ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ২০০৯
পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ ৬ই নভেম্বর, ২০১৮

মুদ্রণে ঃ পাঠক এন্টারপ্রাইজ, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২
চলভাষ ঃ ৯৮৩১০৬০৪৫৯/৯৮৩০০৮৫২৬৮

ত্রিশ টাকা

'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা' – তাই মায়ের অগণিত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এই পুস্তক উৎসর্গীকৃত হল।

আবার কেন

২০০৮ সালে শ্রীশ্রী˚দশমহাবিদ্যা মন্দিরের ৫০তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে 'মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী' পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত মন্ডলীর মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। ফলে খুব অল্প দিনের মধ্যে সব বই নিঃশেষিত হওয়ায় ২০০৯ সালে বইটির পুনর্মূদ্রণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী দুবছরের মধ্যে সেই বইও নিঃশেষিত হয়ে যায়। এরপর নানা কারণে বইটির পুনর্মূদ্রণ করা সম্ভব হয়নি। মুখে মুখে বইটির কথা প্রচারিত হওয়ায় বহু ভক্ত বইটি সংগ্রহ করতে এসে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান। এমতাবস্থায় বহু মানুষের অনুরোধে উৎসাহিত হয়ে এবছর হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে 'মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী' পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। বইটির প্রথম প্রকাশকালে শ্রীশ্রী˚দশমহাবিদ্যার এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাঠকদের কাছে এত আগ্রহ সৃষ্টি করবে এটা আমাদের ধারণায় ছিল না। কিন্তু বইটি প্রকাশনার পর পাঠকদের কাছ থেকে নানা প্রশ্ন ও প্রতিক্রিয়া জেনে আমরা সত্যই অভিভূত। তাই পাঠকদের চাহিদাকে সম্মান জানিয়ে এই সংস্করণে তত্ত্ব ও তথ্য অধ্যায়ে দশমহাবিদ্যার তত্ত্বের কিছু বিস্তারিত বিবরণ সংযোজিত হল। অন্যান্য অধ্যায়গুলি সামান্য সংশোধন ছাড়া প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ যদি এই বইটি পাঠ করে শ্রীশ্রী˚দশমহাবিদ্যা মায়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তি লাভ করেন, তবেই আমাদের প্রকাশনা সফল হয়েছে বলে মনে করব। শ্রীশ্রী˚দশমহাবিদ্যার কৃপা আপনাদের সবার উপর বর্ষিত হোক এই কামনা করি।

শিবপুর বিজয়ী সংঘ

কেন

কেন এই পুস্তক? শ্রীশ্রী৺দশমহাবিদ্যার পূজার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হল। এই মন্দিরের পঞ্চাশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে আর একটু গভীরে গেলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এমন কী গুরুত্বপূর্ণ এই ইতিহাস, যাকে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন আছে। তারই উত্তর খুঁজে নেওয়া যাক বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করার আগে।

শ্রীশ্রী৺দশমহাবিদ্যার মন্দিরে বর্তমানে প্রতিদিন ভক্তজনের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতির হার এবং বিশেষ বিশেষ দিনে বিপুল ভক্ত সমাগম দেখে বোঝা যায় যে এই মন্দিরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল নব্য ভক্তদের মাতৃ মন্দির প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কাহিনী জানবার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের সেই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী হয়ে ওঠার কাহিনী সূত্রে।

শ্রীশ্রী৺দশমহাবিদ্যার এই মন্দির কিন্তু কোন উচ্চকোটির সাধক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। এমনকি কোন সাধকের সাধনস্থলও নয়। বিখ্যাত মন্দিরগুলির নেপথ্যে কোন না কোন সাধকের সাধনা বা আধ্যাত্মিক বিকাশের কাহিনী জড়িত আছে। কিন্তু এই মন্দিরের ইতিহাসে তেমন কোন কাহিনী নেই। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক কাহিনী মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। তার মধ্যে থাকে সত্য ও অসত্যের সংমিশ্রণ। তাই কিংবদন্তীর চোরাবালিতে প্রকৃত ইতিহাস অবলুপ্ত হবার আগে যাঁদের হাত ধরে এই মন্দির গড়ে উঠেছে তাঁদেরই স্মৃতি রোমন্থনে উঠে আসা ঘটনাগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বলাইবাহুল্য, আত্মপ্রচার নয়, শুধুমাত্র মন্দিরের প্রকৃত ইতিহাসকে ভক্তজনের কাছে উপস্থিত করাই এই প্রকাশনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ছাড়া কীভাবে এই মন্দির এক জাগ্রত পীঠস্থানের রূপ নিল, তার উত্তর খুঁজতে গেলে একটাই শব্দ ধ্বনিত হয়– 'ভালোবাসা' বা নিষ্কাম ভক্তি। মা এখানে স্বেচ্ছায় এসে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। নানা ঘটনার ঘনঘটায় ভরা সেই প্রতিষ্ঠার কাহিনী। এক কথায় বলা যায় ভক্ত

ও ভগবানের মধ্যে এক দুরন্ত টানাপোড়েন। কিন্তু কেন? কারণ এই পূজো যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উদযাপিত হয়ে চলেছে, শিবপুর বিজয়ী সংঘের সেইসব সদস্যদের ভক্তি বিশ্বাস নিখাদ। তাই দেখা যায় সন্তানের মৃত্যু বা শারীরিক ক্ষতির মত বিষম বিপর্যয়ও মায়ের এই ভক্তদের ভক্তি বিশ্বাসে চিড় ধরাতে ব্যর্থ হয়েছে। সব ক্ষতি স্বীকার করেও এই সদস্যরা মায়ের চরণে আজও প্রণত। বর্তমানে সকাম ভক্তি মানুষ ও দেবতাকে লেনদেনের জায়গায় এনে বসিয়েছে। অর্থাৎ কোন দেবতা মনস্কামনা পূর্ণ করলে তবেই তাঁকে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করা হবে। আর কোন ক্ষতি হলে সেই দেবতাকে ত্যাগ করে চলে অন্য দেবতার সন্ধান। কিন্তু এই মন্দিরে তার ব্যতিক্রমী স্রোত প্রবাহিত। মা ও তাঁর সন্তানের সম্পর্ক এখানে লাভ ক্ষতির উর্দ্ধে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন- 'ভগবান ভক্তির কাঙাল। ভক্ত যদি এক পা এগোয়, ভগবান দু পা এগিয়ে আসে।' সেই বাণীই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে। বৃন্দাবনের সাধারণ গোপীরা মথুরার রাজা কৃষ্ণের কাছে তাঁর শতাধিক স্ত্রী অপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিল শুধুমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য। এই মন্দিরও কোন সাধকের সাধনস্থল না হয়েও জাগ্রত পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র এই নিখাদ ও নিষ্কাম ভালোবাসার ফলে।

এই ভালোবাসার উৎস সন্ধানে ও এই পূজার ঊনপঞ্চাশ বছরের ইতিহাস খুঁজতেই আমাদের যাত্রা। খড় বাঁশ মাটি দিয়ে প্রতিমার কাজ শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে তা যেমন রঙের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনি কোন প্রতিষ্ঠান নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই একদিন পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছায়। এই মন্দিরের বা দশমহাবিদ্যা পূজার শুরুর শুরু থেকে, বাঁশ খড়ের পর্যায় পেরিয়ে আমরা ধীরে ধীরে জানব মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী হয়ে ওঠার কাহিনী। এই বই পাঠ করে মায়ের মাহাত্ম্য অনুভব করে পাঠক যদি মনের শান্তি, প্রাণের আরাম খুঁজে পান, তাহলেই এই প্রকাশনা সার্থক হবে।

শিবপুর বিজয়ী সংঘ

শুরুর শুরু

যে সময় এই পুজোর শুরু, সেসময় ভূতনাথ হালদার লেনের পরিবেশ ছিল বর্তমানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পথে ছিল গাছের ছায়া, পাখির ডাক, টলটলে পুকুর, খেলার মাঠ প্রভৃতি। কিন্তু আজ তার অধিকাংশই অবলুপ্ত। ঘর বাড়ির সংখ্যাও ছিল কিছু কম। ভূতনাথ হালদার লেন ও শ্রী হরি'ন পাড়া লেনের সংযোগস্থলের কাছেই ছিল এক বিশাল ও গভীর পুকুর। প্রায় প্রতি বছর ঐ পুকুরে একজন না একজন ডুবে মারা যেত বলে জনশ্রুতি ছিল। ফলে পুকুরটার পরিচিতি ছিল 'রাক্ষস পুকুর' নামে। বর্তমানে সেই পুকুরের স্থান দখল করেছে ইঁট সিমেন্টের অট্টালিকা। এছাড়া ছিল 'শোলা পুকুর' ও 'বোল পুকুর', যাদের অস্তিত্ব আজও বর্তমান, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে।

ভূতনাথ হালদার লেন ও শ্রী হরি'ন পাড়া লেনের সংযোগ স্থলের পাশে ছিল পুরানো ভিটের ধ্বংসাবশেষ ও তার সংলগ্ন এক বিশাল শিরীষ গাছের ছায়া ঢাকা এক টুকরো মাঠ। এই মাঠ ছাড়াও আশেপাশে আরও কয়েকটা মাঠ ছিল ছেলেদের বল খেলার জায়গা। একদিন এমনই এক বল খেলায় জয়ী হওয়াকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় 'শিবপুর বিজয়ী সংঘ'। সেটা ছিল ১৯৫৬ সাল। এই সংঘের তৎকালীন সভ্যরা ছিল ফুট টেনিস খেলায় বিশেষ পারদর্শী। তাই মন্দিরতলা বা অন্যান্য অঞ্চলের ফুট টেনিস টুর্নামেন্টে প্রায় প্রতি বছর বিজয়ীর সম্মান লাভ করত শিবপুর বিজয়ী সংঘ। এই খেলাধূলার আনন্দ ছাড়াও আরও কিছু করার তাগিদেই একদিন শুরু হয় শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা।

১৯৫৮ সালে কয়েকজন যুবকের উৎসাহে শুরু হয় শিবপুর বিজয়ী সংঘের কালী পুজো। রাক্ষস পুকুরের পশ্চিম দিকে এক শান্ত শীতল গাছগাছালি ঘেরা ছোট্ট জমিতে মায়ের প্রথম আবাহন। খুবই অনাড়ম্বর ছিল সেই প্রথম আয়োজন। কিন্তু প্রথম থেকেই বারোয়ারী পুজোর স্বাভাবিক চরিত্রের বাইরে গিয়ে এখানে পুজোর আয়োজন হয়েছে কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে। পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধাচার ছিল এর প্রধান অঙ্গ। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে চাঁদা তুলে সামান্য আয়োজনে দু বছর পুজো চলার পর ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে

আড়ম্বর। দু বছর পর কালীপুজো স্থানান্তরিত হয় ভূতনাথ হালদার লেন ও শ্রী হরি'ন পাড়া লেনের সংযোগ স্থলের শিরীষ গাছের ছায়া ঢাকা মাঠে। এই মাঠ এখন তার অস্তিত্ব হারিয়ে ঠাঁই নিয়েছে স্মৃতির পাতায়।

শিরীষ গাছের মাঠে পুজো শুরু হলে মণ্ডপ তৈরী হত বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। সেই সঙ্গে রাক্ষস পুকুরের চারিদিক সাদা গ্লোবের আলোয় সজ্জিত হত। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে পুকুরের মাঝখানে জলের ওপর পদ্মফুলের ভেতর দোলনায় দোলানো হত রাধাকৃষ্ণ। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্মফুলের পাপড়ির খোলা-বন্ধের মাঝে রাধাকৃষ্ণ কখনও হত দৃশ্যমান, আবার কখনও অদৃশ্য। এই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা ছিল জহর মালের মস্তিষ্কপ্রসূত। আজকের উন্নত প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগে যে, সেই যুগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা ছাড়াই শুধুমাত্র বুদ্ধি সম্বল করে কিভাবে এই অসাধ্যসাধন হয়েছিল! পুকুরের জলে ভাসত অসংখ্য বেলুন। সব মিলিয়ে যে দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য সৃষ্ট হত তার আকর্ষণে মানুষের ঢল নামত কালীপুজোর মণ্ডপে। এক সপ্তাহ ব্যাপী চলত কালীপুজোর উৎসব। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় চলত কালী মায়ের পূজারতি। সেই সময় যিনি পুরোহিত ছিলেন, সবার কাছে তিনি টক্কুদা নামেই ছিলেন পরিচিত। ঢাকের তালে তালে নৃত্য ভঙ্গিমায় তিনি আরতি করতেন। আরতির সময় ধুনোর ধোঁয়া আর ধূপের গন্ধে এক অনির্বচনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হত। ভক্তেরা ভিড় করে সেই স্বর্গীয় পরিবেশে আরতি দর্শন করতে করতে খুঁজে পেতেন পরম আনন্দ।

প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রাও ছিল তৎকালীন মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। সন্ধ্যার পর এই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শিবপুর রোড, কাশীনাথ চ্যাটার্জ্জী লেন, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, অবিনাশ ব্যানার্জী লেন প্রভৃতি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে প্রায় মধ্যরাতে গঙ্গায় উপস্থিত হত। কিন্তু রাত যতই গভীর হোক না কেন, পথের মোড়ে মোড়ে দেখা যেত অসংখ্য উৎসুক মানুষের ভীড়। সেই সময় এই শোভাযাত্রার প্রধান আকর্ষণ ছিল গ্যাসের আলোর বিশাল বিশাল গেট, যা এই অঞ্চলের আর কোন বারোয়ারী পুজোর শোভাযাত্রায় দেখা যেত না। সেই বিশাল গেট ঠেলা গাড়িতে বসিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। পাশে পাশে পায়ে হেঁটে চলত ছোট ছোট গ্যাসের আলোর নকশা বহন করা মানুষ। আজকের নিয়ন আলোর যুগে সেই গ্যাসের গেট দুষ্প্রাপ্য। তবে নিয়ন আলোর গেটের ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশী হলেও কারবাইড গ্যাসের সেই গেট গাম্ভীর্যে ও ঐতিহ্যে আজও প্রবীণদের

স্মৃতিতে অমলিন। শোভাযাত্রায় দুটি গেটের মাঝখানে চলত আলী হোসেন, মেহবুব প্রভৃতি নামী ব্যান্ডের বাজনায় জনপ্রিয় গানের সুর। প্রায় দশ দল ব্যান্ড ও দশটি গেট শোভাযাত্রাকে করে তুলত দীর্ঘায়িত। শোভাযাত্রার শেষে লরিতে থাকত ফুলের সাজে সজ্জিত কালী প্রতিমা। আর লরির পেছনে ঢাকের তালে তালে চলত সভ্যদের উদ্দাম নৃত্য। দশমহাবিদ্যারূপে মাতৃ-আরাধনা শুরু হওয়ার পর এগারটি রিক্সায় এগারটি প্রতিমা সহ দীর্ঘায়িত এই শোভাযাত্রা এতই জনপ্রিয় ছিল যে স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ফিরত নিরঞ্জনের তারিখ। নিরঞ্জনের দু-তিনদিন পরে 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' যাত্রাভিনয় ও বালক ভোজনের মধ্য দিয়ে শেষ হত কালীপুজোর উৎসব। 'কল্পনা মঞ্জিল' নামে যে দল এই যাত্রাভিনয় করত, আজ তার কোন অস্তিত্ব নেই।

শুধুমাত্র ফুট টেনিস টুর্নামেন্টে 'চাম্পিয়ন' হওয়া আর কালীপুজোর আড়ম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না সংঘের কার্যকলাপ। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বহুমুখী। এই সংঘের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'শাহজাহান' নাটক। অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী, নরেশ মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূবালা দেবী, সীতা দেবী প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্ব। শিবপুর বিজয়ী সংঘের প্রতি বছরের সারা রাত্রিব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান ছিল এই অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। ছাপার বহু আগেই 'অগ্রিম-বুকিং'-এর মাধ্যমে নিঃশেষিত হয়ে যেত অনুষ্ঠানের টিকিট। হেমন্ত মুখার্জী, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী, আরতি মুখার্জী থেকে শুরু করে শ্রাবন্তী মজুমদার পর্যন্ত বাংলার এমন কোন শিল্পী ছিলেন না যিনি এই বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠিত দলের 'যাত্রা উৎসব' এবং যশস্বী শিল্পী সমন্বয়ে 'রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাত'।

শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যার পূজা মণ্ডপে একাধিকবার আয়োজিত হয়েছে 'স্বেচ্ছা-রক্তদান শিবির'। সেই সময় আজকের মত রক্তদানের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছিল না, ছিল নানা ভ্রান্ত ধারণা ও ভয়। কিন্তু এই প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতিতেও এখানে প্রতি বছর বহু অজানা অচেনা মানুষ এসে রক্তদান করেছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বন্যাত্রাণে, দুঃস্থ পিতার কন্যার বিবাহে বা অন্যান্য সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসত সংঘের সভ্যরা। এই কর্মকাণ্ড রয়েছে আজও অব্যাহত।

এইভাবেই ধীরে ধীরে আগামী দিনের পতাকা বহন করে শিবপুর বিজয়ী সংঘের কালী পুজো এসে দাঁড়িয়েছে আজকের আঙিনায়।

সেকাল

একাল

গঙ্গাবক্ষে নিরঞ্জন

গঙ্গাবক্ষে নিরঞ্জন

বাঁশ খড় মাটি

১৯৬৪ সাল। শিবপুর বিজয়ী সংঘের মাতৃ আরাধনার ইতিহাস নতুন মোড় নিল। শুরু হল শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যাপূজা। মা মহামায়ার কালী-তারা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-ছিন্নমস্তা-ধূমাবতী-বগলা-মাতঙ্গী-কমলা নামক দশটি বিশেষ রূপের একত্রিত আরাধনা। মৃৎশিল্পীর সঙ্গে আলোচনা করে নির্মিত হল প্রতিটি প্রতিমা। সেই সঙ্গে সংযোজিত হল আরও দুটি প্রতিমা– শিব ও সতী। সতী শিবকে তাঁর দশটি রূপ প্রত্যক্ষ করাচ্ছেন এমন ভঙ্গিমায় বর্তমানে মন্দিরে যে ক্রম অনুসারে প্রতিমা সজ্জিত আছে, সেই ক্রম অনুসারেই সাজানো হয়েছিল প্রতিটি প্রতিমা। 'দশমহাবিদ্যা নাম কীর্ত্তনম্' অনুসারে এই ক্রম অনুসরণ করা হয় —

কালী-তারা-মহাবিদ্যা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী-ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধিবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধ বিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।।

বাঁশের মাচার ধাপে ধাপে বসানো হল শিব, তারা প্রভৃতি একাদশটি প্রতিমা এবং মাঝখানে থাকল মা কালীর সেই মূর্তি যা এত বছর ধরে পূজিতা হয়েছেন। মাচাগুলি ঢাকা পড়ল বাখারির ফ্রেমের ওপর আঠা দিয়ে লাগানো খবরের কাগজের পাহাড়ের আড়ালে। এই কাগজের পাহাড় তৎকালীন সংঘ সভ্য শম্ভুনাথ ও কালাইলালের রঙ তুলির ছোঁয়ায় বাস্তবের রূপ নিত। সেই মোহময় পাহাড়ী পরিবেশে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে শোভা পেতে থাকে এক এক প্রতিমা। ১৯৮২ সালে মন্দির নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত এইরকম পাহাড়ী পরিবেশ তৈরী হত প্রতি বছর।

কালীপুজো শুরু হবার চার বছর পর থেকেই ভক্তরা তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য মাকে সোনা-রূপার নানা অলংকার দান করতে থাকেন। প্রথম সোনার জিভ দান করেন মৃণালিনী দেবী ১৯৬২ সালে। এরপর থেকে ভক্তদের সেই দান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, যা আজও একইভাবে চলে আসছে। শুধু অলংকারই

নয়, নানা ধরণের বাসন ও অন্যান্য পূজা উপকরণ দান করেন ভক্তরা। তবে মা যে শুধু কোন দানের বিনিময়ে ভক্তদের মনবাঞ্ছা পূরণ করেন, তা কিন্তু নয়। কারণ এমনও দেখা গেছে কোন ভক্ত মায়ের পুজোয় শারীরিক পরিশ্রমের অঙ্গীকার করে তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করে অন্নকূট মহোৎসবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মায়ের কাছে তাঁর ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করেছেন। এমনকি কোন এক ভক্ত অন্নকূটের প্রসাদ ভোজনের এঁটো পাতা তোলারও মানসিক করেছিলেন এবং মনস্কামনা পূরণের পর অন্নকূটে এসে এঁটো পাতা তুলেছেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি বিশ্বপ্রসবিনী, তাঁর কাছে সোনা-রূপার মূল্য কতখানি। তাঁরই জগতে বাস করে তারই ভাণ্ডার থেকে সোনা-রূপা নিয়ে তাঁকে দান করি আমরা। এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। তাই মানুষের কাছে এই বাহ্যিক বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকলেও মায়ের কাছে তার কি মূল্য তা মা-ই ভাল জানেন! ভক্তের হৃদয়ের আকুল আবেদনই প্রকৃতপক্ষে মাকে আকর্ষণ করে। তাই সেই প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে মা ছুটে আসেন ভক্তের মনবাঞ্ছা পূরণ করতে, অবশ্যই সোনা-রূপার লোভে নয়, শুধুমাত্র নির্মল ভক্তি আস্বাদন করতে।

ভূতনাথ হালদান লেন ও শ্রীহরি'ন পাড়া লেনের সংযোগ স্থলে শিরীষ গাছের ছায়া ঢাকা মাঠে দশমহাবিদ্যা পূজা ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চলে। ১৯৬৬ সালে এক দুর্জ্ঞেয় কারণে পূজা স্থানান্তরিত হয় 'রাক্ষস পুকুর মাঠে'। ইতিমধ্যে সেই বিশাল রাক্ষস পুকুর তার অস্তিত্ব হারিয়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। মাটি দিয়ে বোজানো পুকুরের জমি বসে গিয়ে স্বভাবতই রাস্তা থেকে কিছুটা নিচু হয়ে যায়। কিন্তু আয়তনে এই মাঠ ছিল বিশাল। দশমহাবিদ্যা পুজো স্থানান্তরণের আগে এই মাঠে বসত নাগরদোলা, ঘূর্ণি প্রভৃতি সহ ছোটখাটো মেলা। স্থান পরিবর্তনের ২ বছর পরে ১৯৬৮ সালে আরও একটা ঘটনা দশমহাবিদ্যা পূজার আয়োজনকে মাহাত্ম্যপূর্ণ করে তুলল। সেই ঘটনাটি হল অন্নকূট মহোৎসবের সূচনা। এই অন্নকূট মহোৎসব - অন্ন অর্থাৎ ভাতের উৎসব। অন্নের সঙ্গে থাকে পরমান্ন ও অন্যান্য ব্যঞ্জনের বিপুল আয়োজন। যে বছর এই অন্নকূট মহোৎসব শুরু হল, সেই বছর বাজার দর বিশেষতঃ চালের মূল্য হয়েছিল আকাশ ছোঁয়া। কিন্তু মায়ের লীলা বোঝা আমাদের অসাধ্য। তাই সেই দুর্মূল্যের বাজারে মা সূচনা করলেন অন্নকূট মহোৎসবের মত বিশাল যজ্ঞের। মধ্যাহ্নকালে পাহাড়ের মতো সজ্জিত অন্নের চারিদিকে শুক্ত, ডাল, চচ্চড়ি, ডালনা, চাটনি, পায়েস প্রভৃতি নানা ব্যঞ্জন থরে থরে

সাজিয়ে শুরু হল ভোগ নিবেদন। ঢাকের বোলে, ধূপ ধুনোর ধোঁয়ার মধ্যে চলতে লাগল আরতি। আরতি শেষে সকল ব্যঞ্জন অন্নের সঙ্গে মিশিয়ে ভক্তদের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, আর ভক্তরা হাত পেতে বা আঁচল পেতে সেই মিশ্রিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই পূজা পদ্ধতি তৎকালীন পুরোহিত স্থির করেন, যা আজও একইভাবে অনুসরণ করা হয়। এই সময় চলতে থাকে ঢাকের তালে সংঘ সভ্য ও ভক্তদের উদ্দাম নৃত্য। এইভাবে প্রসাদ দেবার পর সন্ধ্যায় শুরু হয় বসিয়ে প্রসাদ ভোজন করানোর পালা। এই বছরই প্রায় ৩০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ ভোজন করেন। এই সংখ্যা বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ৭০০০-এ পৌঁছে যায়। প্রথম বছর থেকেই কালী পুজোর নিকটবর্তী রবিবারে অনুষ্ঠিত হয় এই অন্নকূট মহোৎসব।

অন্নকূট মহোৎসবের প্রসঙ্গে ভেসে ওঠে প্রথম অন্নকূটের ছবি। প্রথম অন্নকূট মহোৎসব হয়েছিল বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতে। শ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্র গুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী ছিলেন মহাপ্রেমিক বৈষ্ণব মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী কোথাও তিন রাত্রির বেশী বাস করতেন না। কিন্তু তিনিই বাঁধা পড়েছিলেন গোবর্ধন পর্বতে কৃষ্ণসেবায়। আর তাঁরই হাতে সূচনা হয় অন্নকূট মহোৎসবের মত এক সার্বজনীন উৎসবের। এক রাতে মাধবেন্দ্রপুরী স্বপ্ন দেখেন কৃষ্ণ তাঁকে বলছেন - 'শাম্ব পূজিত আমার মূর্তি গোবর্ধন পাহাড়ে মাটির নীচে বহু বছর ধরে পড়ে আছে। তুই সেই মূর্তি উদ্ধার করে নিত্যসেবার ব্যবস্থা কর।' স্বপ্ন ভঙ্গে মাধবেন্দ্র বিহ্বল হয়ে ছুটলেন গ্রামের উদ্দেশ্যে। গ্রামবাসীদের জানালেন তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত। তারপর গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে স্বপ্নে দেখা জঙ্গলের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে শুরু করলেন খনন কার্য। কিন্তু তিন দিন তিন রাত অতিক্রান্ত হয়েও দেখা মিলল না কৃষ্ণ মূর্তির। ফলে হতাশ হয়ে গ্রামবাসীরা মাধবেন্দ্রের স্বপ্নকে ভ্রম মনে করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু মাধবেন্দ্র নিজের দেখা স্বপ্নকে ভ্রম বলে মানতে পারলেন না। সকলে চলে গেলে রাতের অন্ধকারে তিনি একাকী এলেন সেই স্থানে। কোদাল নিয়ে একটু কাটতেই প্রকাশিত হল এক অপূর্ব দিব্যকান্তি কৃষ্ণ মূর্তি। আনন্দে আত্মহারা মাধবেন্দ্র প্রভাতের জন্য অপেক্ষা না করেই ছুটলেন গ্রামের দিকে। গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙিয়ে দেখালেন সেই কৃষ্ণমূর্তি। বললেন — 'আমি রিক্ত সন্ন্যাসী। কৃষ্ণের নিত্যসেবার আয়োজন করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমরা এর প্রতিষ্ঠা ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা কর।' গ্রামবাসীরা সেই রাতেই প্রবল

উৎসাহে নেমে পড়লেন কৃষ্ণ সেবার আয়োজনে। প্রভাত হলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসতে লাগল থরে থরে খাদ্য সামগ্রী। অন্ন ও নানা উপাদেয় ব্যঞ্জনে ভরে উঠল পূজাস্থল। ক্রমে ক্রমে ভোগ নৈবেদ্যর পরিমাণ পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠল। মাধবেন্দ্রর আনন্দ আর ধরে না। তিনি মনের আনন্দে সেই কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। নিবেদন করলেন সকল নৈবেদ্য কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। এরপর কৃষ্ণের প্রসাদ সব একসাথে মিশিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হল। কৃষ্ণের প্রসাদ পেয়ে ভক্তরাও হৃদয়ে পরম আনন্দ লাভ করলেন। সেই পাহাড় প্রমাণ অন্নকে 'অন্নকূট' নামে অভিহিত করা হয়। আর এই উৎসব 'অন্নকূট মহোৎসব' নামে পরিচিত হল। এই দিনটি ছিল কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে অর্থাৎ কালীপূজার পরের দিন। বিভিন্ন মঠ মন্দিরে এখনও ঐদিন অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যার মন্দিরে অবশ্য এই অন্নকূট মহোৎসব কালীপুজোর পরের দিনের পরিবর্তে নিকটবর্তী রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত সমাগমে অন্নকূট মহোৎসব এখন দশদিনব্যাপী বাৎসরিক উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ঐদিন মধ্যাহ্নে পুজোর সময় বা তার পরবর্তী সময়ে মায়ের মূর্তির এক বিশেষ পরিবর্তন ভক্ত মাত্রেই অনুভব করেন। মায়ের সেই উজ্জ্বল মূর্তির মধ্যে দিয়ে মা যেন তাঁর অন্নপূর্ণা রূপ প্রকাশ করে ভক্তদের মনের সকল ক্ষুধা মিটিয়ে দেন। তাই দেখা যায় হাজার হাজার ভক্ত নানা অসুবিধা সহ্য করেও মায়ের অন্নভোগ গ্রহণ করেন এখানে। প্রসাদের লাইনে প্রায় দুঘন্টা দাঁড়িয়ে তারপর ভক্তরা পঙক্তি ভোজনের সুযোগ পান। রাত্রির প্রায় ১টা পর্যন্ত চলে বহিরাগত ভক্তদের প্রসাদ ভোজন। তারপর সংঘের সদস্যদের প্রসাদ ভোজনের পর প্রায় রাত্রি ২টার সময় মায়ের আরতি করে উৎসব শেষ হয়। এরপর চলে সারারাত ধরে মন্দির পরিচ্ছন্ন করার পালা। এত বিশাল এক উৎসবে সকলে মিলে এক সাথে কাজ করার আনন্দে সকলের মনই ভরে থাকে এক অপার্থিব তৃপ্তিতে।

চিন্ময়ী রূপে

১৯৬৯ সাল। চতুর্থবার দশমহাবিদ্যা পূজার স্থান পরিবর্তন হল। এই শেষ স্থান পরিবর্তন যে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সংগঠিত হয়েছিল, তা ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। সে বছর দুর্গাপুজোর পর কয়েকদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে রাক্ষস পুকুর মাঠে প্রায় এক হাঁটু জল জমে যায়। রাস্তা থেকে নিচু জমি বলে এই জল বালতি করে তুলে তুলে বাইরে ফেলা হল। জল বার করার একদিন পরে আবার বৃষ্টির জলে মাঠ ভরে উঠল। তখন কালীপুজোর আর বেশীদিন বাকি নেই। ঐ জল বার করে মাঠ শুকিয়ে সেখানে মণ্ডপ করা অসাধ্য বুঝে বর্তমান স্থানে দশমহাবিদ্যা পূজা স্থানান্তরিত হল। এই স্থানটি ছিল নানা গাছ গাছালিতে ছাওয়া। ছিল এক প্রাচীন বেলগাছ, জামরুল গাছ, নারকেল গাছ প্রভৃতি। বর্তমান মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে ছিল বেলগাছটি। পুজো স্থানান্তরণের সময় অবশ্য এই বেলগাছের অস্তিত্ব ছিল না। যেন বিল্ববৃক্ষে মায়ের বোধন অনেক আগেই সারা হয়েছিল। জামরুল ও নারকেল গাছকে পাশ কাটিয়ে মণ্ডপ তৈরি হল।

তবে এই পূজায় ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সন্ত্রাসময় যুগের সূচনা হয়। সেই সন্ত্রাসে ভীত হয়ে দশমহাবিদ্যা পূজার বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে মাকে সোনা-রূপার অলংকারে সাজানো হবে না। কারণ ঐ অলংকার লুঠ করতে এলে তা প্রতিরোধ করার মত সামর্থ আমাদের ছিল না। পরিবর্তে জরির সাজে মাকে সাজানো হবে। আমরা এতই মূর্খ যে আমরা ভেবে নিয়েছিলাম মায়ের সাজসজ্জা আমাদের ইচ্ছাধীন। বুদ্ধি যিনি আমাদের দিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া বা তাঁকে পরিমাপ করা যে আমাদের সেই বুদ্ধির বাইরে তা বোঝার মত শক্তি আমাদের কোথায়? মা কিন্তু তাঁর অলংকারের সাজ একইভাবে বজায় রাখলেন। কারণ জরির মুকুট লাগাবার জন্য যে মাটির মুকুটটি তৈরী করা হয় সেটি বারবার ভেঙে যাওয়ায় জরির মুকুট শেষ পর্যন্ত লাগানো গেল না। মণ্ডপে প্রতিমা আনার পর স্থির করা হয় যে ফুলের সাজে প্রতিদিন মাকে সাজানো হবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্তও বাতিল হল। কারণ যতবার ফুলের মুকুট পরানো হয় ততবারই তা আপনা

আপনি ভেঙে পড়ে। সেইসময় মাটির প্রতিমা তৈরী করতেন কালীবাবুর বাজারের মৃৎশিল্পী কালীপদ রাম। প্রতি বছর, কুমোরঘরে প্রতিমার কাজ নিষ্পন্ন করতে দেরী করায় প্রতিমা মন্ডপে আনা হত কালীপুজোর দিন সন্ধ্যাবেলা। তারপর মাকে সাজিয়ে অনেক রাতে শুরু হত পুজো। ঐ বছর ফুলের সাজও ব্যর্থ হওয়ায় এবং রাত বাড়তে থাকায় সেই মুহূর্তে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হল যে মায়ের ভান্ডারের সব সোনা-রূপার অলংকারেই মাকে সজ্জিত করা হবে। যে কোন অঘটনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক সদস্য একসাথে দশদিন রাত জাগার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই বছর থেকেই শুরু হয় অন্নকূটের আগের দিন সারারাত ধরে মহিলাদের কুটনো কোটা। অন্নকূটের বিপুল পরিমাণ আনাজ আগের রাতে কাটা শুরু হওয়ায় অন্নকূটের দিন সময় অনেক বেঁচে যায়। অন্নকূট মহোৎসবকে সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য এটাও মায়ের এক অদৃশ্য পরিকল্পনা। কিন্তু কোনও সামান্যতম অঘটন ছাড়াই সে বছর দশদিনের উৎসব যথারীতি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল।

১৯৭০ সাল। দশমহাবিদ্যা মন্দিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরই মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ীরূপের প্রকাশ ঘটে, যা আজও বর্তমান। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পুজোর আয়োজন হয়েছিল একই ধারায়, দশদিনের উৎসবে। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর থেকে ঘটতে লাগল নানা ঘটনা। প্রতিটি ঘটনাই ছিল আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত এবং আমাদের বোধবুদ্ধির বাইরে। ঘটনার প্রথম সূত্রপাত হয় এক মহিলা ভক্তের মাধ্যমে। তিনি এর আগের বছর তাঁর মনস্কামনা পূরণের জন্য মাকে একটি রূপার জবাফুল দিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন যে একটি জবাফুলে মায়ের একটি চরণ ঢাকা থাকলে অপর চরণ কি খালি থাকবে? অতএব তিনি যেন প্রভাত হলেই আরেকটি রূপার জবাফুল মাকে এনে দেন। সেই সঙ্গে তাঁকে মা আদেশ করলেন মাকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবার ব্যবস্থা করার জন্য। প্রভাত হলে সেই মহিলা একটি রূপার জবাফুল কিনে মন্ডপে ছুটে আসেন। অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে তিনি মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেই জবাফুলটি উৎসর্গ করলেন। আর সেই সঙ্গে সংঘের উপস্থিত সভ্যদের কাছে মাকে প্রতিষ্ঠা করার আদেশ জানাতে ভুললেন না। তাঁর সেই স্বপ্নাদেশের কথা কিন্তু কারোর মনেই রেখাপাত করেনি। অতএব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনাই শুরু হল না। এরপর ঘটল আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা। দশমহাবিদ্যা পুজোর একনিষ্ঠ কর্ণধার ছিলেন রামকৃষ্ণ

ঘোষ বা রামকেষ্ট। উৎসবের দশদিন তিনি ঘর বাড়ি ভুলে এই মন্ডপেই থাকতেন সারাক্ষণ। এই বছর উৎসব চলাকালীন তাঁর মা দুর্গাদেবী ছিলেন শয্যাশায়ী। তিনি তাঁর কন্যার শ্বশুর বাড়িতেই ছিলেন। বিছানা থেকে উঠবার মত ক্ষমতাটুকুও তাঁর ছিল না। স্বপ্নাদেশে মা তাঁকে জানালেন যে ছাঁচের জলে একটা জবাফুল ধুয়ে খেলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার কথা তাঁকেও জানালেন। মা তাঁকে বললেন - 'আমাকে প্রতিষ্ঠা না করে বিসর্জন দিলে সব ভাসিয়ে দেব'। স্বপ্ন ভঙ্গে দুর্গাদেবী তাঁর কন্যাকে সব জানালেন। মেয়ে ভাবল, সবরকম চিকিৎসাই তো চলছে, তাহলে ছাঁচের জলে জবাফুল ধুয়ে খাইয়ে দেখা যাক্ না কি হয়। ছাঁচের জলে জবাফুল ধুয়ে খাওয়ানো হল দুর্গাদেবীকে। পরের দিন তিনি সুস্থ হয়ে শয্যায় উঠে বসলেন এবং ধীরে ধীরে মন্ডপে এসে মাকে প্রণাম করে আমাদের কাছে তাঁর কথা জানালেন। মাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মা যে আদেশ দিয়েছেন সে কথা জানিয়ে তিনি বললেন— 'তোরা প্রতিষ্ঠা না করে বিসর্জন দেবার চেষ্টা করলে সব ভেসে যাবে।' কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্নের কথা আমাদের মনে তখনও কোন আলোড়ন তোলেনি। আমরা একবারও ভেবে দেখিনি যে একজন শয্যাশায়ী বৃদ্ধা একদিনে কিভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন দৈব শক্তি ক্রিয়া করেছে। সেই রোদ ঝলমলে সকালে বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা করার কোন সুযোগ ছিল না। তাছাড়া এই পুজো ছিল নিছকই বারোয়ারী পুজো, যা কয়েকদিনের উৎসাহে ও আবেগে অনুষ্ঠিত হত। স্থায়ী ভাবে মাকে প্রতিষ্ঠা করে বারোমাস তাঁর নিত্য সেবার দায়িত্ব নেওয়া মোটেই সহজ নয়। তাছাড়া যে জমিতে পুজো চলছে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে জমির মালিকানার প্রশ্ন ওঠে। সেইসব আইনগত জটিলতার মধ্যে যাবার মানসিকতা সভ্যদের কারোরই ছিল না। ফলে মাকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোনরকম উদ্যোগই শুরু হয়নি।

একে একে দশদিন অতিক্রান্ত হয়ে এল একাদশ দিবস অর্থাৎ বিসর্জনের দিন। পূর্বেই সাধারণ সভায় স্থির করা হয়েছিল যে সেই বছর রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকায় নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বিকালবেলায় শুরু করা হবে, যাতে সন্ধ্যায় গঙ্গায় পৌঁছানো যায়। সেইমত সব আয়োজন করা হয়েছিল। মায়ের লরি সাজানোর জন্য রজনীগন্ধা ফুলের চেন ও মায়ের অঙ্গ সজ্জার জন্য প্রচুর ফুল ও ফুলের অলংকার আনা হয়েছে। বাজনার দলও দুপুর থেকে মন্ডপে উপস্থিত। কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা

হয়েছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। দুই মহিলার স্বপ্নাদেশকে আমরা আমল না দিলেও তৎকালীন পুরোহিত টক্কুদা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই আমাদের অজান্তে তিনি দর্পণে বিসর্জন করতে বিলম্ব করেছিলেন। আকাশের কালো মেঘ এবং টিপটিপ বৃষ্টিপাত দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে মা সত্যই ভাসিয়ে দেবেন। অতএব ঘটের সুতো না কেটে ও দর্পণে বিসর্জন না করে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। অগত্যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে সেদিন বিসর্জন করা যাবে না। ফিরে গেল বাজনার দল। পুরোহিত প্রতিদিনের মত মায়ের পুজো সারলেন। দধিকর্মার আয়োজন সরিয়ে রাখা হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হল তার ফলে মণ্ডপের মধ্যেও জল জমে গেল। পুজোর ঘট যেহেতু উঁচুতে বসানো হত, তাই ঘটের গায়ে এই জল স্পর্শ করেনি। সন্ধ্যাবেলা যথারীতি সন্ধ্যারতির আয়োজন করা হল। তখন সেই বিপুল পরিমাণ রজনীগন্ধা ফুলে মাকে সাজানো হল। সেই ফুলের সাজে মায়ের যে অপরূপ রূপ বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের আজও স্মরণে আছে। এমন দিব্য রূপ সচরাচর দেখা যায় না। সেই ভাগ্যবান প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজন আজও জীবিত আছেন। মণ্ডপে জমে থাকা জলে মায়ের সেই রূপের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠে সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। এই স্বর্গীয় পরিবেশেই পুরোহিত প্রবল উৎসাহে মাকে আরতি করলেন।

গভীর রাতে বৃষ্টির বেগ কমলেও আকাশের কোন উন্নতি হল না। পরের দিনও সেই বৃষ্টি ভেজা পরিবেশ। এইরকম অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে আমরা সকলেই বিহ্বল। পুরোহিত আমাদের বারবার সাবধান করে বলতে লাগলেন — 'তোরা কিন্তু মায়ের স্বপ্নাদেশকে মেনে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা কর। আকাশে মেঘের অবস্থা দেখে তোদের বোঝা উচিত যে তোরা কিছুতেই বিসর্জন করতে পারবি না। বিসর্জন করতে গেলে কিন্তু সত্যিই সব ভেসে যাবে।' তাঁর কথা অরণ্যে রোদন হলেও সেদিনও কিন্তু বৃষ্টির জন্য বিসর্জন করা গেল না।

পরদিন সকালে আমরা যখন মণ্ডপে বসে বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনায় রত তখন বেলা ১১টা। এমন সময় হঠাৎ মানুষের আছাড় খেয়ে পড়ার শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে উঠি। মায়ের দিকে ফিরতেই চোখে

পড়ল এক মধ্যবয়সী বিধবা মহিলা ভিজে কাপড়ে মাটিতে পড়ে মুখ ঘসছেন। তাঁর সারা শরীরে এক অদ্ভুদ কম্পন। সকলে ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই পুরোহিত চিৎকার করে বলে ওঠেন — 'ওরে ওকে কেউ ছুঁস্ না। ওর ভর হয়েছে'। এর আগে ভর বা আবেশের দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই ছিল না। ফলে ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। পুরোহিত মহিলার গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতেই তাঁর শরীরের কম্পন কিছুটা প্রশমিত হল। কিন্তু মাটিতে মুখ ঘষা চলতেই লাগল। সে এক অমানুষিক দৃশ্য। পুরোহিত পুনরায় তাঁর গায়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলেন। এবার তিনি স্থির হয়ে পড়ে রইলেন। পুরোহিত সামনে ঝুঁকে তাঁকে প্রশ্ন করলেন — 'কে তুই? কী চাস?' কেঁপে উঠল মহিলার শরীর। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গেল আদেশ — 'আমাকে বিসর্জন দিস না। আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা কর। নইলে সব ভাসিয়ে দেব।' পুরোহিত বললেন — 'বেশ আমি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছি।' সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা উঠে বসলেন। তাঁর অবিন্যস্ত শাড়ীটাকে গুছিয়ে নিতে নিতে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর খুব ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন - 'আমি কোথায়?' পুরোহিত তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে তাঁর বাড়ি আমতায়। তিনি এই পাড়ায় একটি বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়ে দুদিন আগে এসেছেন। এখানকার পথঘাট কিছুই তিনি চেনেন না। এমন কি এখানে যে একটা পুজো চলছে তাও তাঁর অজানা ছিল। তিনি রান্না করছিলেন। তারপর কী হয়েছে তাঁর মনে পড়ছিল না। ইতিমধ্যে সেই বাড়ির লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে মণ্ডপে আসেন এবং মহিলাকে বাড়ি নিয়ে যান। মণ্ডপে তখন অগণিত মানুষের ভিড়। সবার মুখে আলোচিত হতে থাকে ভরের মুখে মায়ের আদেশের কথা। পরে জানা যায় যে ঐ মহিলা রান্না করতে করতে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান শোলা পুকুরে। এই শোলা পুকুরটি দীনবন্ধু ব্রাঞ্চ স্কুলের পেছনে আজও আছে। কিন্তু তা লোক চক্ষুর আড়ালে। অতএব নতুন কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ পুকুরের অস্তিত্ব জানা সম্ভব নয়। মহিলা কিন্তু দীনবন্ধু ব্রাঞ্চের পাশের গলি দিয়ে শোলা পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে এসে মণ্ডপে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। এই সব কিছুই কিন্তু তিনি করেছেন তাঁর অজ্ঞাতসারে। এখানেই বিস্ময় জাগে। পুরোহিত এবারে আমাদের ওপর রীতিমত চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন মাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু অপরের জমি সংক্রান্ত সমস্যা, বারোমাসের নিত্যসেবা করার মত নিষ্ঠা বা ধৈর্য্য এবং সর্বোপরি আর্থিক

সঙ্গতির কথা ভেবে আমরা কিন্তু কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে যেতে পারলাম না। হায়রে মূর্খ। আমরা আমাদের সংকীর্ণ বৈষয়িক বুদ্ধির মাপকাঠিতে বিষয়টাকে মাপতে চেয়েছি। মায়ের অহৈতুকী কৃপাকে বোঝার মত মানসিক বিকাশ আমাদের কারোরই ছিল না। শুধু মায়ের প্রতি ভক্তি ভালোবাসায় দশদিনের উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু মা আমাদের ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এ যেন মায়ে-পোয়ে জোর লড়াই।

পরের দিন ঘটল আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বেলা দশটার সময় পুজোর আয়োজন চলছে। এমন সময় অন্য এক অপরিচিতা মহিলা ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ পুরোহিতের সামনে এসে সশব্দে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তাঁর সারা শরীরে সেই অদ্ভুত কম্পন। আমরা বুঝলাম আবার ভর হয়েছে। পুরোহিত তাঁর শরীরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতেই স্তব্ধ হল কম্পন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর। বেশ জোরালো আওয়াজে তিনি বলতে লাগলেন — 'আমাকে তোরা প্রতিষ্ঠা কর। আমি আমতায় ছিলাম। কিন্তু ওখানে আমার পুজোয় অনেক অনাচার ঢুকেছে। তাই আমি আমতা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম। এখানকার পুজো আমার ভালো লেগেছে। ছেলেদের ভক্তি নিষ্ঠা দেখে আমার ভালো লেগেছে। এখানে আমার ঘট প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন পুজোর ব্যবস্থা কর। আর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় 'লালভোগ' দিয়ে নিশিভোর আমার পুজো করবি। আমার সঙ্গের ডাকিনী যোগীনি ভূতপ্রেত ঐ লালভোগ খাবে।' পুরোহিত এবার আমাদের হয়ে দরবার করে বললেন – 'ছেলেরা বলছে বারোমাস পুজো করবার মত সামর্থ ওদের নেই। আর এই পুজোর খরচ মিটিয়ে আবার কয়েকদিনের মধ্যে ষোড়শপচারে পুজোর আয়োজন করা ওদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে?' এবার আদেশের সুরে বেজে উঠল কণ্ঠস্বর — 'প্রতিষ্ঠা তোদের করতেই হবে। টাকা না থাকলে একটা থালা পেতে দিবি, তাতেই আমার পুজোর খরচ জোগাড় হয়ে যাবে। আর যদি না হয়, তাহলে কাঁচা থোড় আর চালের কুঁড়ো দিয়ে আমার পুজো করবি। আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকব।' ভেঙে গেল আবেশ। মহিলা ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। পুরোহিতের নির্দেশে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। এক নিঃশ্বাসে জলটুকু পান করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অবিন্যস্ত কাপড় গুছিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর ক্লান্ত অবসন্ন পদক্ষেপ দেখে মনে হল যেন তাঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

পুরোহিত এবার আমাদের সামনে রুদ্র মূর্তিতে উপস্থিত হলেন। বললেন — 'তোরা শুনেছিস মায়ের আদেশ। আজ চারদিন হয়ে গেল, কিন্তু তোরা মাকে বিসর্জন দিতে পারিস নি। তোরা কিন্তু এখনই মায়ের প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর, নতুবা ফল কিন্তু ভালো হবে না।' ঘটনা পরম্পরায় আমাদের মনেও তখন ভয় ঢুকেছে। পরপর সম্পূর্ণ অপরিচিতা মহিলাদের এইভাবে ভর বা আবেশ হওয়ার ঘটনাকে আর উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতেই হল। কিন্তু সত্যই তখন প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতির কারণে তাম্রঘট কেনার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে সেই চিন্তাই আমাদের গ্রাস করল। এমন চিন্তার মধ্যেই দুজন সদস্য এগিয়ে এলেন দায়িত্ব নিয়ে। তাম্রঘট কেনার অর্থ তাঁরাই দুজনে জোগালেন। এরপর ঘট কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে, বেদী কিভাবে তৈরী হবে ও আনুষঙ্গিক সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং সেইমত আয়োজন সম্পূর্ণ করা হল।

পরদিন রাসপূর্ণিমা। তৈরী হল সিমেন্টের বেদী। আর তার মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করা হল তাম্রঘট। সেই ঘট আজও একই অবস্থায় আছে। বিভিন্ন সময় মন্দিরে নানা পরিবর্তন হলেও ঘটটির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি। কালীমূর্তি তখন বসানো হত বাঁশের মাচার ওপর। তার সামনে থাকত পূজার ঘট। ফলে সেখানে বেদী তৈরী করা যায়নি। বেদী নির্মিত হল প্রতিমার পশ্চাতে এবং একটি শাড়ি দিয়ে বেদীর সঙ্গে প্রতিমার সংযোগ তৈরী করা হল। পরবর্তী বছর থেকে ঐ বেদীর পশ্চাতে প্রতিমা বসানো হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ঐ বেদী কিন্তু গড়ে ছিলেন এক মুসলমান মিস্ত্রী এবং বেদী তৈরীর সময় আপামর ভক্ত অংশ নিয়েছিলেন। কেউ ইঁট বসিয়ে, কেউ সিমেন্ট লাগিয়ে এই কাজে অংশ নিয়েছিলেন। পরে জানা গেছে যে ঐ সময় অনেকেই মাকে তাঁদের মনস্কামন জানিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেরই মনস্কামনা পূরণ হয়েছে অপ্রত্যাশিত ভাবে। নানা জাতের মানুষের সমবেত অংশগ্রহণে প্রমাণিত হয় মায়ের কাছে সকল সন্তানই সমান। সেখানে জাত-পাতের কোন বালাই নেই। সারদামায়ের সেই কথা — 'শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজাদও তেমন' যেন এখানে আক্ষরিক অর্থে প্রমাণিত হয়েছে। মায়ে-পোয়ের যুদ্ধে সন্তানকেই শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছে। মূর্খ সন্তানের অহেতুক ভাবনাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল মাতৃশক্তির অহেতুকী কৃপা। মা প্রায় একরকম জোর করেই সেদিন এখানে বসেছেন। পরবর্তীকালে এই জমি সংক্রান্ত কোন সমস্যাই দেখা দেয়নি। কারণ জমিটি ছিল ধর্মপ্রাণা নিঃসন্তান বিরাজমণি দাসীর। তাঁর

অবর্তমানে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী কখনও এই জমির স্বত্ব দাবি করেনি। ফলে বোঝাই যায় মা সুপরিকল্পিত ভাবেই ধর্মপ্রাণা বিরাজমণির ভিটেতে বিরাজিত হয়েছেন।

পরেরদিন বিসর্জনের পালা। সেইমত আয়োজন চলছে। এমন সময় এক স্থূলদেহী বিধবা বৃদ্ধার আবেশ দেখা দিল। পুজো চলাকালীন তিনি শুরু করলেন নৃত্য। ঢাকীরা উন্মাদের মতো ঢাক বাজাতে লাগল। সেই ঢাকের তালে তালে উদ্দাম নৃত্যের মাঝেই তিনি হঠাৎ সিঁদুরের কৌটো থেকে সিঁদুর তুলে সামনের এক মহিলার কপালে দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন - 'তোরা সিঁদুর খেলিস না কেন? এখানে এসে সিঁদুর খেলবি।' সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মহিলারা তাঁর কপালে সিঁদুর দিয়ে তাঁকে রাঙিয়ে দিলেন। পুরোহিত তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন একটা রক্ত জবার মালা। তাঁর নৃত্যের সঙ্গে উপস্থিত সকলেই একে একে শুরু করল নৃত্য। সেই সমবেত উদ্দাম নৃত্যের মাঝে মাঝে তিনি অট্টহাস্য করতে লাগলেন। সেই হাসির শব্দ ঢাকের শব্দকে ছাপিয়ে মণ্ডপে অনুরণিত হতে লাগল। প্রায় আধঘন্টা নৃত্যের পর যখন সকলেই প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে তখনও কিন্তু সেই বৃদ্ধার নৃত্য সমান তালে চলতে থাকে। প্রায় ষাটোর্ধ্ব স্থূলদেহী এক মহিলা কীভাবে এমন নৃত্য করতে পারেন তা আজও আমাদের জ্ঞানের বাইরে। পুরোহিত ক্রমাগত গঙ্গাজল ছিটিয়ে ক্রমশঃ তাঁর আবেশের বেগ প্রশমিত করলেন। অবশেষে তিনি সশব্দে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেলেন। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। পরিধানের সাদা শাড়ি তখন সিঁদুরে রাঙা। ছিন্নভিন্ন জবার মালার একাংশ তখনও গলায় ঝুলছে। অবসন্ন শরীরে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। সেই থেকে বিসর্জনের দিন মহিলাদের সিঁদুর খেলা উৎসব প্রচলিত হল, যা আজও অক্ষুণ্ন আছে।

এরপর পুরোহিত পূজা সমাপন করে দর্পণে মায়ের বিসর্জন করলেন। বিকালে যথা নিয়মে শোভাযাত্রা সহকারে ফুলের সাজে সজ্জিত প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জিত হল। সন্ধ্যায় বেদীতে প্রতিষ্ঠিত ঘটে পুনরায় সন্ধ্যারতি করে শুরু হল মায়ের নিত্য পূজা। পরদিন মণ্ডপ খুলে বেদী ঘিরে গড়ে তোলা হল দরমাঘেরা টালির চালের এক অস্থায়ী ঘর এবং সেই ঘরেই চলতে লাগল প্রতিদিনের পূজা। ১৯৮২ সালে মন্দির নির্মাণ পর্যন্ত প্রতিবছর দশদিনের উৎসবের সময়

ঐ অস্থায়ী চালাঘর খুলে মণ্ডপ তৈরী হত এবং উৎসব শেষে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর পুনরায় অস্থায়ী চালাঘর নির্মাণ করা হত। এই বছর থেকেই মায়ের আদেশে শুরু হল অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় নিশিভোর মায়ের পূজা। পূজার আয়োজন হল ঐ বেদীতেই। বেদী সজ্জিত হল ফুলের মালায়, বসানো হল দশমহাবিদ্যার বাঁধানো ফটোগ্রাফ। টালির চালের দরমাঘেরা ঘরটাও সজ্জিত করা হয় আলো আর ফুলে। মায়ের আদেশানুসারে 'লাল ভোগ' অর্থাৎ বলিদানের উদ্দেশ্যে সামনে রাখা হল হাড়িকাঠ। হিমেল রাতে ভক্তমণ্ডলী বসলেন খোলা আকাশের নীচে। ষোড়শোপচারে আয়োজিত হল পূজা। নানারকম নতুন ফল, জয়নগরের মোয়া প্রভৃতি দেওয়া হল নৈবেদ্যে। আর ভোগে নিবেদন করা হল খিচুড়ি, নতুন গুড়ের পায়েস, ফুলকপি, বাঁধাকপি, সিম, পালংশাক প্রভৃতি। মা যেহেতু অভিমান করে বলেছিলেন টাকা না থাকলে কাঁচা থোড় ও চালের কুঁড়োর নৈবেদ্য দিতে, তাই সেই নৈবেদ্যও দেওয়া হয় মাকে। বলাই বাহুল্য এই বিপুল আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মা-ই জুগিয়ে দিয়েছেন। সভ্যদের মধ্যে দু-একজন সারাদিন উপবাস করে নিশি শেষে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। অবশ্য কালীপূজার দিন অনেক সভ্যই সারাদিন উপবাস করে রাত্রে পূজা শেষে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তারপর উপবাস ভঙ্গ করেন। এইভাবেই চলেছে বারো বছর।

স্থায়ী রূপে

মায়ের ঘট প্রতিষ্ঠিত হবার পর অস্থায়ী চালাঘরেই মায়ের নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। পাড়ার তিনজন মধ্যবয়স্কা মহিলা ভক্ত প্রতিদিন স্বেচ্ছায় মায়ের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পুজোর আয়োজন করতেন, একজন সকালে বেদী ধুয়ে পরিষ্কার করতেন এবং অপরজন চালাঘরের মাটির মেঝে নিকিয়ে দিতেন। এই নিত্য কাজের কোন ছেদ হয়নি কোনদিন। এমনকি সন্তানের মৃত্যুতেও পুজোর আয়োজনে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। এমনই ছিল তাঁদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা। চালাঘরের পরিবর্তে একটি স্থায়ী মন্দির নির্মাণের কথা আমাদের মনে হলেও প্রধানতঃ আর্থিক সঙ্গতির অভাবে সেই চিন্তা কার্যকরী হয়নি। আর্থিক সঙ্গতি ছাড়াও আরও নানা দ্বিধা, সংকোচ, ভীতি প্রভৃতি কারণে মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ কয়েকবছর থেমে থাকে। ইতিমধ্যে রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। নানা আড়ম্বরের মধ্যে মন্দির নির্মাণ শুরু করার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

অবশেষে ১৯৮২ সালে শুরু হয় মন্দির নির্মাণ। ইতিপূর্বে ভরের মুখে মায়ের আদেশ অনুসারে এক রাসপূর্ণিমায় মন্দিরের ভিত পূজা করা হয়। সোনা, রূপা, পান্না, হীরা, চুনীর পঞ্চরত্ন ভিতে রাখা হয়। স্বল্প অর্থের তহবিল নিয়ে প্রথম পদক্ষেপে মাত্র সাতটি স্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা করে কাজ শুরু করা হয়। মাত্র গুটিকয়েক সদস্যের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই কাজ শুরু হলেও অনতিবিলম্বে প্রায় সকল সদস্য ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আর্থিক ঘাটতি কাটিয়ে উঠে প্রথম পর্যায়ে গর্ভমন্দিরের ছাদ ঢালাই করা হয়েছিল। মন্দিরের পরিকাঠামোর স্থাপত্য পরিকল্পনা কিন্তু কোন ইঞ্জিনিয়ারের নয়। কারণ দু-তিনজন ইঞ্জিনিয়ার যে নকসা দেখিয়েছিলেন তা আমাদের পছন্দ না হওয়ায় বাতিল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রাজমিস্ত্রীদের মধ্যে প্রধান মিস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বর্তমান মন্দিরের পরিকাঠামো তৈরী হয়। গর্ভ মন্দিরের উচ্চতা, পরিধি এবং একাদশ প্রতিমা স্থাপন করার বেদী এবং প্রতিটি বেদীর উচ্চতা প্রভৃতি মাপ নির্ধারিত হয়েছিল আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গর্ভমন্দিরের উচ্চতা হয় ২৩ ফুট এবং পরিধি ৪৫০ বর্গফুট। ৪৫০ বর্গফুট ছাদের মাঝখানে কোন বীম দেওয়া হবে

না বলে আমরা স্থির করি। সেই অনুসারে স্তম্ভ ও ছাদের চারিদিকের বীমের মাপ স্থির করা হয়। এত বিশাল ছাদ মাঝখানে বীম ছাড়া থাকবে কিনা এ নিয়ে আমাদের সংশয় থাকলেও শেষ পর্যন্ত এইভাবেই কাজ শুরু করা হয়।

দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে মাটিতে প্রথম কোদালের কোপ পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে প্রধান স্তম্ভগুলি গড়ে তুলে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমায় ছাদ ঢালাই করা হয়। ছাদ ঢালাই করার দিন আমরা আনন্দে অধীর। কারণ ঘট প্রতিষ্ঠার বারো বছর পর অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আমাদের স্বপ্নের মন্দিরের বাস্তব রূপায়ণের সূচনা হয় ঐদিন। সারাদিন রোদ ঝলমল পরিবেশে ঢালাইয়ের কাজ হবার পর বিকালবেলায় কাজ শেষ হল। মিস্ত্রীরা ঘরে ফিরে গেলে সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে ঢালাইয়ের সিমেন্ট ধুয়ে যাবার আশঙ্কায় আমরা দুশ্চিন্তায় অবশ হয়ে পড়লাম। রামকৃষ্ণ ঘোষ সহ আমরা তিনজন বাঁশের মই বেয়ে ছাদে উঠলাম ত্রিপল ঢাকা দেবার জন্য। কিন্তু ঐ বিশাল ছাদ ঢাকার মত যথেষ্ট ত্রিপল ছিল না। তাছাড়া প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় ঐ সুউচ্চ ফাঁকা ছাদে দাঁড়ানো বেশ মুশকিল। ফলে একটি ত্রিপলকে কোন রকমে ছাদের মাঝখানে পেতে আমরা অতি কষ্টে বাঁশের মই দিয়ে নেমে এলাম। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদের জ্যোৎস্না দেখা দিল। কিন্তু আমরা সারারাত কাটালাম দুশ্চিন্তায়। পরের দিন সকালে ছাদে উঠে দেখা গেল বৃষ্টির জন্য তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। পক্ষান্তরে সিমেন্ট জমাট বাঁধার জন্য বৃষ্টির জল সাহায্য করেছে। প্রধান মিস্ত্রীও বেশ দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে সেই রাত। তার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল অন্য। ২৩ ফুট উচ্চতায় ৪৫০ বর্গফুট ছাদের ঢালাই করার জন্য প্রয়োজন হয় লোহার পাইপ দিয়ে নির্মিত জোগান বা 'মুট'। কিন্তু এখানে সাধারণ লম্বা বাঁশের জোগানের ওপর রাখা হয়েছিল ছাদ। বাঁশের উচ্চতা ২৩ ফুট না হওয়ায় ইঁটের থাকের ওপর স্থাপন করা হয় বাঁশগুলিকে। এই বাঁশের জোগানের ধারণ শক্তিতে ৪৫০ বর্গফুটের ছাদের ওজন কতটা ফলপ্রসূ হবে এই চিন্তায় প্রধান মিস্ত্রীর রাতের ঘুম চলে গিয়েছিল। পরদিন অতি ভোরে সবার অলক্ষ্যে এসে দেখে যায় ছাদ পড়ে গেছে কিনা। ছাদটিকে অক্ষত অবস্থায় দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মায়ের বেদীতে প্রণাম জানায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই আগের মতই নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছিলাম বলেই বাঁশের জোগান বা বৃষ্টিপাতে বিচলিত হয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগেছি। আমরা বুঝতে পারিনি

যে যাঁর মন্দির, তিনি স্বয়ং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন, অতএব তাঁর ইচ্ছায় নির্মিত মন্দিরে কোন বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ঘট প্রতিষ্ঠার পর বারো বছর অতিক্রান্ত হবার পিছনে নিশ্চয়ই তাঁরই ইচ্ছা কার্যকরী ছিল। এই প্রবল বৃষ্টি বা বাঁশের জোগানের দুর্বলতা কোন বাধা হয়েই দাঁড়ায়নি।

সাতটি স্তম্ভের ওপর ৪৫০ বর্গফুটের ছাদের নীচেই সেই বছর মণ্ডপ তৈরী করে দশদিনের উৎসব অনুষ্ঠিত হল। উৎসব শেষে সেখানে পুনরায় অস্থায়ী চালাঘর নির্মাণ করে নিত্যপুজো চলতে থাকে। ধীরে ধীরে নির্মিত হল নাট মন্দির। নাট মন্দিরের উচ্চতা গর্ভ মন্দির থেকে ৮ ফুট কম। নাট মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হলে শুরু হল স্থায়ী প্রতিমা নির্মাণের উদ্যোগ। কুমারটুলির মৃৎশিল্পী পরেশ পালকে সিমেন্ট প্লাস্টারের প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হল। শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করা হল যে মাটির কালী প্রতিমার মুখের ছাঁচেই নির্মিত হবে সিমেন্ট প্লাস্টারের কালী প্রতিমার মুখ। অগত্যা পরেশ পালের প্রেরিত এক ব্যক্তি বিসর্জনের দিন মন্দিরে উপস্থিত হয়ে নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন করা হলে সেই ব্যক্তি আমাদের অলক্ষ্যে কালী প্রতিমার মুখ ভেঙে নিয়ে গিয়ে ছাঁচ নির্মাণ করেন। সেই ছাঁচেই তৈরী হয় বর্তমান কালী প্রতিমার মুখ। ফলে মাটির প্রতিমার সঙ্গে সিমেন্টের কালী প্রতিমার কোন রূপগত পার্থক্য তৈরী হয়নি। একাদশটি প্রতিমা বিভিন্ন বেদীতে স্থাপিত হলে মাঝখানে মা কলীর মূর্তি স্থাপিত হয়। ঐ সুউচ্চ প্রতিমা সিমেন্ট প্লাস্টারে নির্মিত হওয়ায় মাটি থেকে তুলে বেদীতে স্থাপন করার জন্য শিয়ালদহ অঞ্চল থেকে বেশ কিছু কুলি আনা হয়। কুলিরা বড় বড় শালখুঁটি ও বাঁশের মাঝখানে পুলি ও কপিকল লাগিয়ে প্রতিমা তোলার আয়োজন করতে লাগল। তাদের এই আয়োজনের ফাঁকে যে বেদীতে মায়ের মূর্তি স্থাপিত হবে, তাতে সুন্দর করে আলপনা দেওয়া হল। কুলিদের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে রামকৃষ্ণ ঘোষ তাদের সর্দারকে ডেকে মাকে একটু বাতাসা দিয়ে পুজো দিতে বললেন। কিন্তু বিহারী কুলি সর্দার সে কথায় কর্ণপাত করল না, কারণ, এর চেয়ে অনেক বেশী ওজনের 'মাল' তুলতে তারা অভ্যস্ত। 'মাল' আর মায়ের মৃন্ময় মূর্তি যে একই বস্তু নয়, সে কথা তার মতো অজ্ঞান মানুষের বুদ্ধিতে আসেনি। অতএব নিজেদের শারীরিক শক্তির ওপর আস্থা রেখেই তারা প্রতিমা উত্তোলনের উদ্যোগ নিয়ে পুলি ও কপিকলে দড়ি বাঁধল। কিন্তু দড়ি বেঁধে সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভারি

ওজনের পুলি ও কপিকল দড়ি ছিঁড়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ভাগ্যক্রমে যেখানে পড়ল সেখানে কোন লোক ছিল না। কোন লোকের মাথায় ঐ ভারি ওজনের পুলি ও কপিকল পড়লে তার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। কুলিদের শরীরে আঘাত না লাগলেও আঘাত লেগেছিল কুলি সর্দারের মনে। তার দীর্ঘদিনের মাল তোলার চলতি হিসাব হঠাৎ যেন থমকে যায়। সে উপলব্ধি করে যে মায়ের মৃন্ময় মূর্তি তুলতে গেলে তাঁর কৃপালাভের প্রয়োজন আছে। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বাতাসা ও ধূপ কিনে এনে পুজো দেয়। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তারা পুনরায় প্রতিমা উত্তোলনের উদ্যোগ নিল। শাল কাঠের বড় বড় দুটি খুঁটিকে ইংরাজী 'A' অক্ষরের মতো ভঙ্গিমায় বেঁধে তার সংযোগস্থলে বাঁধা হয় পুলি ও কপিকল। সেই কপিকলের মধ্য দিয়ে দড়ি চালান করে মায়ের মূর্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে ধীরে ধীরে শাল খুঁটি সরিয়ে ক্রমে বেদীতে এনে স্থাপন করা হয়। প্রায় কুড়িজন সমর্থ কুলিদের ঘাম ঝরা পরিশ্রমে মায়ের মূর্তি বেদীতে স্থাপিত হয়েছিল। মায়ের মূর্তি উত্তোলন করে ঝুলন্ত অবস্থায় আনার সময় দেখা গেল শালখুঁটির মাথা ছাদ থেকে মাত্র ১ বা ২ ইঞ্চি নীচে আছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র মায়ের মৃন্ময় মূর্তিটি উত্তোলনের জন্য গর্ভমন্দিরের ২৩ ফুট উচ্চতার প্রয়োজন ছিল। এই উচ্চতার সামান্য হ্রাস হলে কিন্তু সেদিন মূর্তি উত্তোলন করা সম্ভব হত না। এই ঘটনায় ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া মন্দির নির্মাণে মায়ের ইচ্ছা বা পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। একে একে সকল প্রতিমা বেদীতে স্থাপিত হলে মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হল। দশমহাবিদ্যার স্থায়ী মূর্তিতে এবার নিত্য সেবা শুরু হল।

এই কর্মকান্ডের পর প্রথাগতভাবে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হয় ১৯৯২ সালে কালীপুজোর আগের দিন সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের পূজনীয় সন্ন্যাসী। উপস্থিত ছিলেন চিত্রাভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী, ডঃ বিমল সেন প্রমুখ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্যে গর্ভমন্দিরে আবরণ উন্মোচন করে মায়ের নবনির্মিত মূর্তি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

কৃপার বাতাস

তন্ত্রানুসারে দশমহাবিদ্যার কঠিন পূজা পদ্ধতি বা তাঁর গুহ্য তত্ত্ব আমাদের অজানা। তবুও এখানে দশমহাবিদ্যার পূজা কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তা এক আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু একটু গভীরে মনোনিবেশ করলে এর উত্তর পাওয়া যায়। মা যেখানে নিজে এসে বসেছেন, সেখানে মানুষের সৃষ্ট আচার বিধি অমূলক। তাই শুধু ভক্তি অর্ঘ্যেই মা এখানে সন্তুষ্ট। তন্ত্রমতের আচার নিয়ম এখানে কখনই প্রযোজ্য নয়। এখানকার পূজা পদ্ধতি প্রথম পুরোহিত টঙ্কুদাই চালু করেছেন। এরপর পুরোহিতের পরিবর্তন হলেও পরিবর্তিত হয়নি পূজা পদ্ধতি।

আগেই বলেছি যে এখানে পূজা পদ্ধতি মায়ের ইচ্ছানুসারে স্থির হয়েছে। মা নিজেই প্রতি মুহূর্তে শিখিয়েছেন করণীয় কর্তব্য। মায়ের আদেশে শুরু হয়েছে সিঁদুর খেলা। একবছর অন্নকূটের আরতি শেষে এক মহিলা ভরের মুখে আদেশ দেন - 'আমার নামে জয়ধ্বনি দে'। সেই থেকে অন্নকূটের আরতি শেষে মায়ের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়। তারপর অন্ন ও অন্যান্য ব্যঞ্জন মিশিয়ে ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়। আর একবার অন্নকূটের পুজো শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ভক্তদের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এক মহিলার ভর হয়। তিনি ভিড়ের মধ্যেই টলতে টলতে এগিয়ে এসে বেদীর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন — 'সবই তো দিয়েছিস, কিন্তু খাবার জল দিসনি কেন?' তখন দেখা গেল সত্যই পূজার আয়োজনে মায়ের জলপানের ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী আমরা। লোকমুখে শুনলে হয়ত অবিশ্বাস হত, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় বিশ্বাসে ঘাটতি নেই। নানা ঘটনার মধ্যে কয়েকটা উল্লেখ করা যায়। যেমন ১৯৭৬ সালের ঘটনার হিসাব আজও মেলেনি। সে বছর অন্নকূট মহোৎসবে রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছিল। রাত্রি নটার সময় দেখা গেল প্রসাদের জন্য লাইন ভূতনাথ হালদার লেন ছাড়িয়ে শিবপুর রোডে বেলতলার কাছে পৌঁছেছে। রাস্তার ওপর নিজেদের হাতে গড়া বাঁশের গেট হঠাৎ ভিড়ের চাপে ভেঙে যায়। জলস্রোতের মত মানুষ ছুটে আসতে থাকে মণ্ডপের দিকে। ভিড়ের ধাক্কায় অনেকেই পড়ে যায়

মানুষের পায়ের তলায়। সেই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বেচ্ছাসেবকরা নাজেহাল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরাও বিহ্বল। এককথায় পুরো পরিস্থিতি তখন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। হঠাৎই দেখা গেল লাইনের মানুষ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন ও অদ্ভুতভাবে শৃঙ্খলারক্ষা করছেন। যাঁরা ইতিমধ্যে মণ্ডপে বা তার সংলগ্ন স্থানে ঢুকে পড়েছেন তাঁরাও বসে পড়েছেন। যাঁরা বসার সুযোগ পাননি তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। অতি সাধারণ পোষাকের এক মহিলা লাইনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করে লাইনের শৃঙ্খলা বজায় রাখছিলেন। তাঁকে দেখে এই বেসামাল পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কিছুটা আঁচ করা গেল। কিন্তু অবাক হবার ব্যাপার ছিল এটাই যে একজন মহিলা কোন যাদুর স্পর্শে সেই উত্তাল জনসমুদ্রকে শান্ত করলেন, যাকে সামাল দিতে যুবক স্বেচ্ছাসেবকরা হিমসিম খেয়েছে। কিন্তু তখন আমাদের এত গভীরে চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। কারণ জনজোয়ারের ফলে প্রসাদেও টান পড়েছে। প্রসাদ যা ছিল তা দিয়ে এই জন সমুদ্রকে সেবা করা যাবে না অনুমান করেই সভ্যদের মধ্যে চাঁদা তুলে কয়েক বস্তা আলু, কুমড়ো ও অন্যান্য আনাজ কিনে আনা হল। নিয়মানুসারে অন্নকূট মহোৎসবে একজন ভক্তকেও অভুক্ত অবস্থায় ফেরানো যায় না। আনাজের ব্যবস্থা হলেও চালের ব্যবস্থা করা যায়নি। কারণ তখন আমাদের আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট ছিল না। চালের ব্যাপারে যখন আমরা চিন্তিত তখন দেখা গেল রিক্সা করে দু বস্তা চাল এসে উপস্থিত। রিক্সাওয়ালা জানালো যে বাজারের কোন এক দোকানদার চাল পাঠিয়ে দিয়েছে। তাকে ভাড়া মিটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাল চাপানো হল উনুনে। এদিকে বিপুল পরিমাণ আনাজ কাটা চলছে দ্রুত গতিতে। দু-তিনজন মহিলা ও রাঁধুনী ব্রাহ্মণের লোকেরা আনাজ কাটায় তেমন গতি আনতে পারছিলেন না, এমন সময় সেই মহিলা এসে হাত লাগালেন। নিমিষের মধ্যে ক্ষিপ্র গতিতে তিনি শেষ করলেন আনাজ কাটা। অল্প সময়ের মধ্যে রান্না সম্পন্ন করে প্রসাদ বিতরণ চলতে লাগল। ভক্তরা প্রসাদ সেবার মাঝেই আনন্দে মায়ের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। রাত প্রায় দুটোর সময় প্রসাদের পালা শেষ হয়। শেষ পঙক্তিতে আমরা প্রসাদ পাই। সেই মহিলা সারাক্ষণই নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও কোন পঙক্তিতে বসে প্রসাদ পেতে দেখা যায়নি। সবশেষে তাঁকে আমাদের সঙ্গে শেষ পঙক্তিতে বসতে বললে তিনি জানালেন যে, তাঁর খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি যে কখন চলে গেছেন তাও কেউ দেখেনি। এক অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও তা সুষ্ঠুভাবে উৎরে যাওয়ায় আমরা

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কিন্তু সেই দু-বস্তা চাল কে পাঠিয়েছিলেন তার জবাব আজও মেলেনি। আর একজন সাধারণ মহিলা কিভাবে অশান্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং একাধারে কুটনো কোটা, পরিবেশন করা ও লাইন নিয়ন্ত্রণ করা সব কাজেই অংশগ্রহণ করলেন, সেটাও আমাদের অবাক করেছে। আজ মনে হয়, নিজের পূজার সুনাম রক্ষা করার জন্য মা নিজেই হয়ত ছদ্মবেশে এসে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছেন। কারণ দৈবীশক্তি ছাড়া একজন সাধারণ মহিলার পক্ষে এইকরম ভূমিকা পালন করা কখনই সম্ভব নয়। আমরা তাঁর লীলার কতটুকুই বা বুঝতে পারি।

প্রতিবছর দশ দিনের উৎসবের মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা মায়ের সন্ধ্যারতির পর ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান হত। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যশস্বী শিল্পীরা একাধিকবার এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। কিন্তু অর্থাভাবে কয়েক বছর এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়নি। অথচ মায়ের আদেশে আবার সেই অনুষ্ঠান শুরু হয়, যা আজও অব্যাহত। ঘটনাটা ঘটেছিল সম্ভবত ১৯৭৯ সালে। দশদিনের উৎসব চলছে। এর মধ্যে একদিন বিকালে আমরা দু-তিন জন সদস্য মণ্ডপে চেয়ারে বসে গল্পে মত্ত। এমন সময় দেখলাম ভূতনাথ হালদার লেন ও মন্দিরের রাস্তার সংযোগস্থলে এক ভদ্রলোক ও দুজন মহিলা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা মণ্ডপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কি যেন বললেন। তারপর তাঁরা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁরা মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে লাগলেন। আমাদের মনোযোগ তাঁদের প্রতি ছিল না। এমন সময় মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ার শব্দে সেদিকে তাকিয়ে দেখি তাঁদেরই মধ্যে একজন মহিলা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন এবং মাটিতে হাত পা ঘসছেন। শরীরে সেই অদ্ভুদ কম্পন। দেখে বোঝা গেল তাঁর ভর হয়েছে। এর আগে যখনই কারোর ভর হয়েছে তখন এখানে পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নিজে যা কিছু করণীয় তা করেছেন। কিন্তু সেই সময় পুরোহিত অনুপস্থিত। ফলে আমরা বিভ্রান্ত। আমাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ঘোষ তাড়াতাড়ি মণ্ডপের পাশের রকে উপবিষ্টা বিধবা মহিলাকে গিয়ে বললেন—'ও পিসিমা, ঘর থেকে গঙ্গাজল এনে ওঁর গায়ে একটু ছিটিয়ে দিন না।' অনেকবার ভরের সময় পুরোহিতের কার্যকলাপ দেখে আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে আবেশতাড়িত শরীরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ

হয়ে যেত তার কম্পন। পিসিমা আমাদের তাড়নায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে গিয়ে গঙ্গাজল এনে ভীত সন্ত্রস্ত হাতে মহিলার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল কম্পন। এবার সেই মহিলা বলতে লাগলেন—'তোরা গান বাজনা বন্ধ করে দিয়েছিস কেন। আমি গান খুব ভালোবাসি। এখানে গানের আয়োজন কর।' এরপর কিছুক্ষণ নিথর ভাবে পড়ে থেকে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন তিনি। সেই ভদ্রলোক ও মহিলা এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। এবার এগিয়ে এসে মহিলাকে হাত ধরে তুললেন। আমরা একটা চেয়ার এগিয়ে দিতেই তিনি অবসন্ন শরীরে সেই চেয়ারে বসে শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক আমাদের অনুরোধ করলেন একটু গরম দুধের জন্য। পিসিমা তাই শুনে ছুটে ঘরে গিয়ে এক কাপ দুধ গরম করে আনলেন। মহিলাটি ধীরে ধীরে সেই দুধ পান করে যেন কিছুটা শক্তি ফিরে পেলেন। আরও কিছুক্ষণ তিনি একইভাবে বসে রইলেন। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের কাছে জানা গেল যে এই পুজো তাঁদের কাছে একেবারেই অজানা ছিল। কার্যোপলক্ষ্যে ভূতনাথ হালদার লেন দিয়ে যাবার সময় ঐ মহিলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে এই মণ্ডপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন যে এখানে জাগ্রত মায়ের অধিষ্ঠান আছে, চল দর্শন করে আসি। প্রকৃতপক্ষে এই পুজো যাঁদের কাছে অজানা, ভূতনাথ হালদার লেনে দাঁড়িয়ে তাঁদের পক্ষে এখানকার মণ্ডপের অস্তিত্ব অনুভব করা শক্ত। কারণ ঐ স্থান থেকে মণ্ডপের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হত না। ফলে এর বিশালতা ও মাহাত্ম্য অজানাই থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঐ মহিলা সেদিন কিসের আকর্ষণে মণ্ডপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তা আজও আমাদের কাছে অজানা। মহিলাটির কথায় ওঁরা তিনজন মণ্ডপে এসে উপস্থিত হয়ে মায়ের মূর্তি দর্শনে অভিভূত হয়ে যান। দর্শন করতে করতেই এই মহিলার আবেশ উপস্থিত হয়। তিনি আরও জানালেন যে ঐ মহিলা বাড়িতে প্রতিদিন মায়ের পুজো করেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর শরীরে মায়ের ভর হয়। এরপর দু-তিনদিন তিনি অবসন্ন হয়ে থাকেন। দুধ খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁরা তিনজনে তাঁদের গন্তব্যস্থলে যাওয়া বাতিল করে বাড়ির পথ ধরলেন।

১৯৮০ সালের অন্নকূট মহোৎসবে দেখা গেল এই পাড়ার এক যুবক অমানুষিক পরিশ্রম করছে। আগের রাতে সারারাত কুটনো কোটার সময় থেকে শুরু করে অন্নকূটের দিন প্রায় মধ্য রাত পর্যন্ত নিঃশব্দে নানা কাজে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু শরীরে যেন কোন ক্লান্তি নেই। এই যুবকটি

পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করত না। কারণ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গ থেকে বাঁচিয়ে তার মা তাকে তথাকথিত ভদ্র-সভ্য করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ফলে মাঝে মাঝে মাঠে একটু আধটু বল খেললেও ক্লাবের নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিকনিক বা অন্য কোন ব্যাপারে তাকে পাওয়া যেত না। এমন এক গা বাঁচানো ছেলেকে হঠাৎ এত উৎসাহী ভূমিকায় দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তার সেই উৎসাহের নেপথ্য কাহিনী জানা যায় নি। কয়েক বছর পর তার মাসতুতো ভাইয়ের কাছে জানতে পারি যে দীনবন্ধু ব্রাঞ্চের মাঠে বল খেলতে গিয়ে ঐ ছেলেটির পায়ে ইঁট ফুটে যায়। প্রথমে তেমন কোন লক্ষণ দেখা না গেলেও কিছুদিন বাদেই ঐ স্থানটিতে পচন শুরু হয়। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে হাঁটুর নীচ থেকে বাকি অংশ কেটে বাদ দিতে হবে। এমতবস্থায় তার মা দশমহাবিদ্যা মায়ের কাছে চোখের জলে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে তাঁর ছেলের পা কেটে বাদ না গেলে, তাঁর ছেলে সুস্থ হলে অন্নকূটে শ্রমদান করবে। মায়ের চোখের জল বিশ্বজননীর চিত্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তাঁর কৃপায় ছেলেটির পা অক্ষত থাকে এবং সে সুস্থ হয়ে অন্নকূটে নিরলস শ্রম দান করে তার মায়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এই ঘটনায় একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মা শুধু অলংকারের মানসিক করলেই ঈপ্সিত ফলদান করেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাই অন্নকূটে অর্থ, সামগ্রী বা অন্যান্য দান নয়, শুধুমাত্র 'শ্রম' দান করার মানসিক করেই কিন্তু ছেলেটি তার জীবনের একটা বিরাট ক্ষতি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মায়ের কাছে মূল্যবান জাগতিক বস্তুর কোন মূল্য নেই। তিনি মূল্য দেন ব্যাকুলতাকে। তাঁর কাছে আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করলে ফল লাভ করা যায়। আমরা ভুলে যাই যিনি বিশ্বপ্রসবিনী, তাঁকে আমরা ক্ষুদ্র অলংকারে কতটা ভরাতে পারি। 'কত রত্ন মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।'

কয়েক বছর আগের কথা। অনেক বছর ধরে মন্দিরে গঙ্গাজল রাখা হত একটা পুরানো মাটির জালায়। মায়ের মূর্তির পশ্চাতে ভাণ্ডারে রাখা ছিল সেই জালা। পুরোহিত প্রতিদিন সেই জালা থেকে গঙ্গাজল তুলে সারতেন তাঁর পূজা। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা এক অপরিচিতা মহিলা এসে জানালেন যে তাঁর এক বান্ধবী স্বপ্নে জেনেছেন যে দশমহাবিদ্যা মন্দিরের গঙ্গাজল অশুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই দশমহাবিদ্যা মন্দির কোথায়, তা ছিল বান্ধবীর

কাছে অজানা। ফলে তিনি এই ভদ্রমহিলার কাছে তাঁর স্বপ্নের কথা জানান। এই ভদ্রমহিলা দশমহাবিদ্যা মন্দির চিনতেন। তাই তিনি এখানে এসে সংবাদটি পৌঁছে দেন। সেই মহিলার কথা শুনে গঙ্গাজলের জালা পরীক্ষা করে দেখা গেল সত্যই জলে পোকা হয়েছে, যা গঙ্গাজলে কখনো হয় না। পুরোনো জালাটি তৎক্ষণাৎ বাতিল করে বর্তমানের জলাধারটি কিনে আনা হয়। যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনিও পরে এসে মন্দির ও মাকে দর্শন করে যান।

একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ঐ বেদীতে নিজ হাতে ইঁট বসাবার সময় এখানকার একজন সদস্য মনে মনে মাকে জানিয়েছিল যে যদি কোনদিন তাদের নিজস্ব বাড়ি হয়, তাহলে সে অন্নকূটের চাল দেবে। এরপর অনতিবিলম্বে তারা জমি কিনে বাড়ি করে সেখানে চলে যায়। কিন্তু মায়ের কাছে অঙ্গীকারের কথা একদম ভুলে যায়। বেশ কয়েক বছর পর কালীপূজার দিন সন্ধ্যাবেলা ঐ ব্যক্তি ঘরে শুয়েছিলেন আধো জাগরণ আধো নিদ্রার মধ্যে। হঠাৎ দেখলেন ঘরের আবছা আলোর মধ্যে মায়ের মুখটি ফুটে উঠল। মা তাকে বললেন - 'কিরে নিজস্ব বাড়ি হলে অন্নকূটের চাল দিবি বলেছিলি, আর নিজস্ব বাড়ি হবার পর সেই অঙ্গীকার ভুলে গেলি।' এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সেই সদস্য সম্বিত ফিরে পান। তখন তাঁর মনে পড়ে যায় সেদিনের সেই অঙ্গীকারের কথা। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে আসে মন্ডপে। এখানে এসে তার অশ্রুসিক্ত চোখে সবার কাছে এই ঘটনা জানালো। সে এখন অন্নকূটের চাল দিয়ে তার কথা রাখতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু অন্নকূটের বিপুল পরিমাণ চাল দেওয়া তার আর্থিক সঙ্গতির বাইরে। অগত্যা স্থির হল যে সে একবস্তা চাল আনবে এবং সেটাই প্রথমে রান্না করা হবে। সেই মতো তার চাল দিয়েই শুরু হয় অন্নকূটের ভাত রান্না।

এমনি আরও অনেক বিক্ষিপ্ত অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে মা আজও আমাদের কাছে তাঁর উপস্থিতির পরিচয় দেন। কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারলেও বহু ঘটনা থেকে যায় আমাদের জানার বাইরে। তবে ভক্ত মাত্রেই মায়ের উপস্থিতি এখানে অনুভব করেন। অধিকারীভেদে হয়ত তার বিভিন্নতা থাকে। যাঁরা তাঁর কৃপার বাতাস অনুভব করতে পারেন, তাঁরাই সেই বাতাসের স্পর্শে ধন্য হয়ে যান।

তত্ত্ব ও তথ্য

পৌরাণিক কাহিনী মতে ভগবতীর দশমহাবিদ্যা রূপ একত্রে প্রথম দর্শন করেছিলেন শিব। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী তাঁর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত সকল দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতির মধ্যে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, সর্পালংকারে ভূষিত, ভস্মাচ্ছাদিত দেবাদিদেব মহাদেবের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পন করেন। উপস্থিত অভিজাত অতিথিদের পরিবর্তে ভিখারী শিবের কণ্ঠে মালা দেওয়ায় প্রজাপতি দক্ষের আভিজাত্যে আঘাত লাগল। পিতার সম্মানকে উপেক্ষা করে সতী শিবের সঙ্গে কৈলাসে চলে এলেন। কৈলাসে শিবপুরীতে শশ্মানচারী নেশাখোর স্বামীর ঘরণী হয়ে স্বামীর অনুচর ও গণ ভূতপ্রেত, নন্দী ভৃঙ্গীর সঙ্গে শুরু করলেন সংসার যাত্রা। এদিকে ক্ষুব্ধ দক্ষ এই অপমানের জ্বালা জুড়াবার জন্য আয়োজন করলেন এক বিশাল যজ্ঞের। এই যজ্ঞে ত্রিলোকের সকলে নিমন্ত্রিত হলেও শিব এবং সতী রইলেন নিমন্ত্রণের বাইরে। যথাসময়ে দেবর্ষি নারদ শিবপুরীতে উপস্থিত হয়ে শিবের সম্মুখে এই যজ্ঞের সংবাদ নিবেদন করলেন। কিন্তু ঐ শিবহীন যজ্ঞের কথা শুনে স্বয়ং শিবের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ভোলানাথ রইলেন নির্লিপ্ত। তাঁর এই নির্লিপ্ততা দেখে দেবর্ষি বুঝলেন যে তাঁর উপভোগ্য পরিস্থিতি অর্থাৎ ঘটনার জটিলতা তৈরীর চেষ্টা ব্যর্থ হল। অগত্যা তিনি চললেন মা সতীর কাছে। মায়ের কাছে গিয়ে নারদ বিস্তারিতভাবে যজ্ঞের আয়োজনের কথা জানালেন। সেই সঙ্গে শিব ও সতীর যে নিমন্ত্রণ হবে না সেই সংবাদটুকুও পরিবেশন করতে ভুললেন না। নারদমুখে যজ্ঞের সংবাদ পেয়ে সতী পিতৃগৃহে যাবার জন্য খুবই উৎসাহিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর অনুমতি লাভের জন্য শিবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সতীর প্রস্তাব শুনে শিব কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কারণ মহাদেব বুঝেছিলেন যে তাঁকে অপমান করার জন্যই দক্ষ এই শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। ঐ যজ্ঞে সতী উপস্থিত হলে স্বামীর অপমান সহ্য করতে পারবে না এবং ফলস্বরূপ ঐ যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু শিবের অনুমতি না পেয়ে সতী ভাবলেন যে তিনি যে বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বমাতা সে কথা শিব ভুলে গিয়ে তাঁকে একজন সাধারণ নারী হিসাবে ভাবছেন। তাই সতী তাঁর শক্তি প্রকাশ করে শিবকে অনুমতী দানে বাধ্য করতে চাইলেন। সতী একে একে কালী, তারা,

ষোড়শী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা রূপ শিবের সম্মুখে প্রকাশ করতে লাগলেন। মহাশক্তির সেই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত শিব সেখান থেকে পলায়ণে তৎপর হলেন। কিন্তু যে দিকেই যেতে চান সেই দিকেই দেখেন দশমহাবিদ্যার একটা রূপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে যখন দশমহাবিদ্যার দশটি রূপ দশদিকে ব্যাপ্ত, তখন শিব কড়জোড়ে সতীর কাছে তাঁর রূপ সংবরণ করার জন্য প্রার্থনা করলেন। দেবী ভগবতী তুষ্টা হয়ে তাঁর সকল রূপ অপ্রকট করলেন। শিবও অনিচ্ছা সত্ত্বেও সতীকে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যজ্ঞস্থলে পৌঁছে পিতা দক্ষের কাছে শিবনিন্দা শুনে সতী যজ্ঞস্থলেই যোগ্নানির মাধ্যমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হল এবং তিনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে সতীর প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে স্থাপন করে শুরু করলেন তান্ডব নৃত্য। তাঁর অনুচরবৃন্দ যজ্ঞ পণ্ড করে দিল। পৃথিবী শিবের নৃত্যে প্রকম্পিত হতে লাগল। তখন শ্রী বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে বিভাজিত করলেন। সতীর এই একান্নটি দেহাংশ পৃথিবীর বুকে পড়ে সৃষ্টি করল একান্নটি শক্তিপীঠ।

দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ হলেন 'কালী'। মহাভাগবত মতে মহাকালীই হচ্ছেন মুখ্য বা প্রধান। দার্শনিক দিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যায় কালতত্ত্বের প্রাধান্যই সবার উপরে।, এই সূত্র ধরেই বলা হয় কালীই সমস্ত বিদ্যার আদি। কালিকাপুরাণের কাহিনী অনুসারে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে দেবতাদের স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী ভগবতী আবির্ভূর্তা হন। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর থেকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা তেজস্বিনী এক দিব্য নারী প্রকট হন। সেই নারী কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন বলেই তাঁর নাম হয় 'কালী'। শ্রীশ্রী চন্ডী অনুসারে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্য দেবতারা দেবীসূক্ত পাঠ করে ভগবতীর বন্দনা করেন। তখন গৌরীর দেহ থেকে এক গৌরবর্ণা দেবী আবির্ভূতা হন। ইনি দেবী কৌশিকী নামে খ্যাত। গৌরীর দেহ থেকে দেবী কৌশিকী নির্গতা হলে গৌরীর দেহ কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যায়। তখন তাঁর নাম হয় 'কালী'। কালী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভূজা। তাঁর এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে অসুরের ছিন্ন মুণ্ড শোভিত। তাঁর অপর দুই হস্তে বরাভয় ও অভয় মুদ্রা। তিনি মুক্তকেশী, দিগ্‌বসনা। তাঁর গলায় ছিন্ন মুণ্ডের মালা এবং কটিদেশে ছিন্ন হস্তের বলয়। পদতলে শায়িত মহাকাল। কালীর পূজায় নানা মত ও নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ কালীর দুটি রূপের উপাসনা প্রচলিত আছে – দক্ষিণা

কালী ও বামা কালী। শিব বক্ষে কালীর দক্ষিণ চরণ আগে থাকলে তাঁকে দক্ষিণা কালী ও বাম চরণ আগে থাকলে তাঁকে বামা কালী বলা হয়। ভববন্ধন মোচনের জন্য কালীর উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, মথুর বাবুর সঙ্গে কাশী ভ্রমণের সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখেছিলেন যে মণিকর্ণিকার শ্মশানে চিতায় শায়িত শবদেহের পাশে গিয়ে দিগ্বসনা আলুলায়িত কেশ মা কালী তাদের সকল পাশ ছিন্ন করছেন ও স্বয়ং বিশ্বনাথ তাদের কানে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছেন। ভক্তিমার্গে শরণাগত হয়ে যে কোন ভাবে কালীর উপাসনা ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু সিদ্ধিলাভের জন্য কালীর উপাসনা করতে গেলে তা বীরভাবে হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ মন্ত্র বা মনের একাগ্রতা নিয়ে কালীর ধ্যান করে যেমন মাকে প্রসন্ন করা যায়, তেমনি তন্ত্র অর্থাৎ তনু বা শরীরের নানা ক্রিয়ার দ্বারা গুরু নির্দেশিত পদ্ধতিতে সাধনার দ্বারাও মায়ের কৃপা লাভ করা যায়। তবে যে পদ্ধতিই অনুসরণ করা হোক না কেন, সবসময় নিষ্ঠা ও সততাই এনে দেয় অভীষ্টলাভে সাফল্য।

তন্ত্রমতে দশমহাবিদ্যার যে রূপ সর্বদা মোক্ষদায়িনী, তারিণী, তিনিই **'তারা'** নামে আরাধিতা। সহজেই বাক্‌শক্তি প্রদান করেন বলে তাঁকে 'নীল সরস্বতী'ও বলা হয়। ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন বলে এঁর আরেক নাম 'উগ্রতারা'। বৃহন্নীল তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে হয়গ্রীবকে বধ করার জন্য ইনি নীল বিগ্রহ ধারণ করেছিলেন। শবরূপ শিবের উপর ইনি প্রত্যালীঢ় মুদ্রায় দণ্ডায়মান। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও গলায় মুণ্ডমালা। দেবী নীলবর্ণা, নীল কমলের মতো তিনটি নয়ন, স্ফীত উদর। তিনি করোটি, খড়্গ ও পদ্মফুল ধারণ করে আছেন। দেবী তারার তিনটি রূপ - তারা, একজটা ও নীল সরস্বতী। এই তিন রূপের রহস্য, কার্যকলাপ, ধ্যান ও পূজা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তবে তারা দেবীর উপাসনা প্রধানতঃ তান্ত্রিক পদ্ধতি বা আগমোক্ত পদ্ধতিতে করা হয়। 'আচার' তন্ত্রে বশিষ্ঠ মুনির আরাধনা উপাখ্যান অনুসারে ভারতবর্ষে প্রথম তারা মায়ের উপাসনা করেন বশিষ্ঠ মুনি। কিন্তু তিনি প্রথমে বৈদিক পদ্ধতিতে উপাসনা করায় সিদ্ধিলাভ করতে অসমর্থ হন। অতঃপর তিনি তারামন্ত্রকে ব্যর্থ মন্ত্র বলে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে তান্ত্রিক পদ্ধতি বা 'চীনাচার' পদ্ধতিতে উপাসনা করার জন্য দৈবাদেশ পান। মহামুনি বশিষ্ঠ সেই নির্ধারিত তান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক সিদ্ধিলাভ করেন। স্বতন্ত্র

তন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে তারা দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল সুমেরু পর্বতের পশ্চিম ভাগে 'চোলনা' নামে নদীর ধারে অথবা চোলৎ সরোবরের তীরে। মহাকাল সংহিতায় কাম-কলা খণ্ডে বলা হয়েছে 'তারা রাত্রি'তে দেবী তারার উপাসনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীর রাত্রিকে 'তারা রাত্রি' বলা হয়।

চৈত্রমাসি নবম্যাং তু শুক্লপক্ষে তু ভূপতে।
ক্রোধরাত্রির্মহেশানি তারারূপা ভবিষ্যতি।।
(পুরশ্চর্যানব, ভাগ-৩)

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মহাকাল সংহিতা'-র গুহ্যকালী খণ্ডে মহাবিদ্যার উপাসনার যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, সেখানে বর্ণিত তারা রহস্য অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

মাহেশ্বরী শক্তির সবচেয়ে সুন্দর শ্রীবিগ্রহধারিণী সিদ্ধ দেবী হলেন 'ষোড়শী'। ষোড়শ অক্ষরের মন্ত্রময়ী এই দেবীর অঙ্গপ্রভা নবারুনের আভার মত। দেবী চর্তুভূজা ও ত্রি নয়না। ইনি শায়িত সদাশিবের নাভি থেকে উদ্‌গত পদ্মের ওপর শান্তমুদ্রায় আসীন। তাঁর চার হাতে পাশ, অঙ্কুশ, ধনুক ও বাণ শোভিত। ষোলকলায় পূর্ণরূপে বিরাজিত হওয়ায় দেবী ষোড়শী নামে খ্যাত। তন্ত্রশাস্ত্রে ষোড়শী দেবীর বর্ণনা ভিন্ন। এখানে দেবী পঞ্চবক্তা বা পাঁচটি আননযুক্তা। তাঁর চারদিকে চারটি ও উর্দ্ধে একটি মুখ শিবের 'তৎপুরুষ', 'সদ্যোজাত', 'বামদেব', 'অঘোর' ও 'ঈশান' এই পাঁচটি রূপের প্রতীক। পাঁচটি মুখের রঙ সবুজ, লাল, ধূম্র, নীল ও পীত। তন্ত্রে দেবী ষোড়শী তাঁর দশটি হাতে অভয়, টঙ্ক, শূল, বজ্র, পাশ, খড়্গ, অঙ্কুশ, ঘন্টা, সর্প ও অগ্নি ধারণ করে আছেন। আবার অন্য শাস্ত্র মতে ষোড়শীকে শ্রীবিদ্যাও বলা হয়। ইনি ললিতা, রাজরাজেশ্বরী, মহাত্রিপুর সুন্দরী, বালা পঞ্চদশী প্রভৃতি অনেক নামে ভূষিতা। দশমহাবিদ্যার অন্যান্য মহাবিদ্যার দেবীরা সাধককে ভোগ অথবা মোক্ষ - এর মধ্যে যে কোন একটি প্রদান করেন। কিন্তু দেবী ষোড়শী তাঁর উপাসককে ভোগ ও মোক্ষ দুইই প্রদান করেন। শঙ্করাচার্য শ্রীবিদ্যা রূপে ষোড়শী দেবীর উপাসনা করেছিলেন। তাই আজও সকল শঙ্কর পীঠে ষোড়শী দেবীর রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুর সুন্দরী রূপের পূজা 'শ্রীযন্ত্রে'র মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আচার্য শঙ্কর রচিত 'সৌন্দর্য লহরী'তে ষোড়শী শ্রীবিদ্যার স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী একবার পরাম্বা পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রশ্ন করেন - 'হে ভগবন্! আপনি যে তন্ত্র পদ্ধতি প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা জীবের আধি-ব্যাধি, শোক-সন্তাপ ইত্যাদি তো দূর হবে জানি, কিন্তু জীবের জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণাবর্ত থেকে তো মুক্তি হবে না। দয়া করে জীবকুলের এই দুঃখের নিবৃত্তি ও মোক্ষলাভের উপায় যদি বলেন, তবে সকল জীবকুল ধন্য হবে।' পরম কল্যাণময়ী পরাম্বার প্রার্থনায় ভগবান শঙ্কর ষোড়শী শ্রীবিদ্যা সাধন প্রণালী ব্যক্ত করেন। ভৈরবযামল তথা শক্তিলহরীতে ষোড়শী দেবীর উপাসনার বিস্তৃতি বিবরণ আছে। মহামুনি দুর্বাসা এঁর পরম সাধক ছিলেন। শ্রী-চক্রের মধ্যেই এঁর উপাসনা করা হয়।

দেবী ভাগবতে বর্ণিত মণিদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হল্লেখা (হ্রীং) মন্ত্রের স্বরূপ শক্তি ও সৃষ্টির ক্রম পর্যায়ে মহালক্ষ্মী স্বরূপ আদিশক্তি ভগবতী **'ভুবনেশ্বরী'** নামে খ্যাত। তিনি দেবদিদেব মহাদেবের সকল লীলা বিভূতির সহচরী। দেবীপুরাণ অনুসারে মূলা প্রকৃতির অপর নাম ভুবনেশ্বরী। ঈশ্বররাত্রে যখন ঈশ্বরের জাগতিক ক্রিয়া সুপ্ত থাকে তখন শুধুমাত্র ব্রহ্ম তাঁর অব্যক্ত প্রকৃতিসহ বর্তমান থাকেন। সেই সময় সেই ঈশ্বররাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ভুবনেশ্বরী। শ্রীশ্রী চন্ডীর একাদশ অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের বর্ণনা অনুসারে ভুবনেশ্বরী দেবীর সৌম্য মূর্তি ও অঙ্গকান্তি অরুন বর্ণ। তাঁর হস্তে অঙ্কুশ, পাশ, বরদ ও অভয় মুদ্রা। মহানির্বাণ তন্ত্র অনুসারে সকল মহাবিদ্যাই ভগবতী ভুবনেশ্বরীর সেবায় সর্বদাই নিরত থাকেন। সাতকোটি মহামন্ত্র সর্বদা এঁর আরাধনা করেন। দশমহাবিদ্যার কালী তত্ত্ব থেকে শুরু করে কমলা তত্ত্ব পর্যন্ত দশটি স্থিতি বা পর্যায় আছে। যার থেকে অব্যক্ত ভুবনেশ্বরী ব্যক্তরূপে ব্রহ্মাণ্ডের রূপ ধারণ করতে পারেন আবার প্রলয়কালে কমলা থেকে অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ থেকে ক্রমশঃ লয় হয়ে কালীরূপে মূলা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিতা হন। এইজন্য এঁকে কালের জননীও বলা হয়। বৃহন্নীল তন্ত্র ও দেবীভাগবত অনুসারে দুর্গম নামক অসুরকে বধ করার জন্য দেবতা ও ব্রাহ্মণরা দেবী ভুবনেশ্বরীর আরাধনা করেন। সেই আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূতা হন। তাঁর হাতে ছিল বাণ, পদ্মফুল ও শাকমূল। তাঁর চক্ষু থেকে সহস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। সেই জলে জগতের সব প্রাণীর তৃষ্ণা নিবারিত হয়। নদ-নদী, সমুদ্র অজস্র জলে পূর্ণ হয় এবং সমস্ত ওষধি সঞ্জীবিত

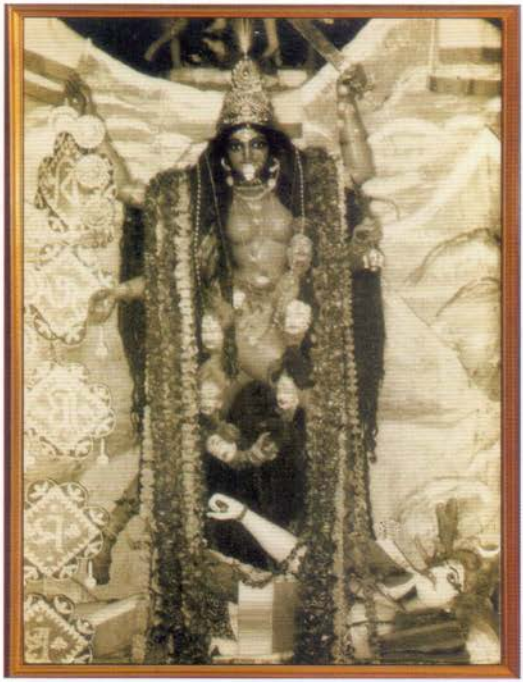

সাবেকি মূর্তি

অন্নকূট মহোৎসব

ফল বিতরন

বস্ত্র বিতরন

হয়ে ওঠে। তাঁর হস্তে ধারণ করা শাক ও ফলমূলে প্রাণীদের পালন করার জন্য দেবী ভুবনেশ্বরী 'শতাক্ষী' বা 'শাকম্ভরী' নামে খ্যাত হন। ইনিই দুর্গমাসুরকে বধ করে তার দ্বারা অপহৃত বেদগ্রন্থ দেবতাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। তাই দেবী ভুবনেশ্বরীর আরেক নাম 'দুর্গা'। রুদ্রযামলতন্ত্রে দেবীর কবচ, নীলসরস্বতীতন্ত্রে তাঁর হৃদয় এবং মহানির্বাণতন্ত্রে তাঁর সহস্রনাম বর্ণিত আছে।

ক্ষীয়মান বিশ্বের অধিষ্ঠাতা হলেন কালভৈরব। সেই ভৈরবের শক্তিই **'ভৈরবী'** নামে পূজিতা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এঁকে গুপ্ত যোগিনীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মৎসপুরাণে এঁর ত্রিপুর ভৈরবী, কোলেশ ভৈরবী, রুদ্র ভৈরবী, চৈতন্য ভৈরবী, নিত্যা ভৈরবী প্রভৃতি রূপের বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় বিজয় ও সর্বত্র উৎকর্ষ প্রাপ্তির জন্য ভৈরবী দেবীর উপাসনার কথা বলা হয়েছে। শ্রীশ্রী চন্ডীর তৃতীয় অধ্যায়ে মহিষাসুর বধ প্রসঙ্গে দেবী ভৈরবীর ধ্যান বর্ণিত হয়েছে। ইনি পদ্মাসীনা, রক্তবর্ণা, রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, কণ্ঠে মুন্ডমালা ধারিণী। এঁর দুই হস্তে জপমালা ও পুস্তক। অপর দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা। এঁর অরুন বর্ণ, বিমর্ষতার প্রতীক। কণ্ঠে সুশোভিত মুন্ডমালা হল বর্ণমালা। দেবীর রক্তলিপ্ত পয়োধর রজোগুণ সম্পন্ন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতীক। হস্তের অক্ষজপমালা বর্ণসমন্বয়ের প্রতীক এবং পুস্তক ব্রহ্মবিদ্যার প্রতীক। ইনিই মধু পান করে মহিষের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন। রুদ্রযামল গ্রন্থের ভৈরবকুলে সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে ভৈরবী দেবীর উপাসনা ও কবচের উল্লেখ আছে। আগমতন্ত্রানুসারে ভৈরবী হলেন একাক্ষররূপা (প্রণব)। এঁর থেকেই সমগ্র ভুবন প্রকাশিত হয় এবং অন্তে এঁর মধ্যেই লীন হয়। ত্রিপুর ভৈরবীর স্তুতিতে বলা হয়েছে যে ইনি সূক্ষ্ম, বাক্ ও জগতের মূল কারণের অধিষ্ঠাত্রী। সৃষ্টির মধ্যে সর্বদাই পরিবর্তন হয়। এর মূল কারণ হল আকর্ষণ - বিকর্ষণ। এই সৃষ্টির ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের মধ্যে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকেই বৈদিক মতে ভৈরবী বলা হয়। এঁর রাত্রির নাম কালরাত্রি এবং ভৈরবের নাম কালভৈরব।

পরিবর্তনশীল জগতের অধিপতি হলেন কবন্ধ এবং তাঁর শক্তিই **'ছিন্নমস্তা'** নামে পূজিতা। জগতে হ্রাস – বৃদ্ধির চক্র সর্বদাই ঘূর্ণিত হচ্ছে। হ্রাসের মাত্রা যখন কম হয় অর্থাৎ বিকাশের মাত্রা যখন বৃদ্ধি পায় তখন মা ভুবনেশ্বরীর আর্বিভাব হয়। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ যখন নিগম

বৃদ্ধি পায় ও আগম হ্রাস পায় তখন মা ছিন্নমস্তার আধিপত্য বিরাজ করে। দেবী ছিন্নমস্তার স্বরূপ অত্যন্ত গুহ্য। একমাত্র অধিকারী সাধকই এর রহস্য জানতে সক্ষম। পুরাণে দেবী ছিন্নমস্তার আর্বিভাবের কাহিনী বর্ণিত আছে। একবার দেবী ভবানী তাঁর দুই সহচরী জয়া ও বিজয়াকে নিয়ে মন্দাকিনীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। স্নানান্তে ক্ষুধায় কাতর হয়ে দেবী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেলেন। তাঁর সহচরীরাও তাঁর কাছে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করল। দেবী তাদের একটু প্রতিক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ প্রতিক্ষা করার পর যখন সহচরীরা পুনরায় খাদ্য প্রার্থনা করল, তখন দেবী তাদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। ক্ষুদাপীড়িত সহচরীরা তখন বিনীতভাবে মাকে বলল—'মা তো নিজের সন্তানকে ক্ষুধা পেলে অবিলম্বে খাদ্য দেয়, তাহলে আপনি আমাদের উপেক্ষা করছেন কেন?' সহচরীদের এই করুণ বাক্য শুনে দেবী সঙ্গে সঙ্গে নিজের খড়গ দিয়ে নিজ মস্তক ছেদন করলেন। দেবীর খণ্ডিত মস্তক এসে পড়ল তাঁর বাম হস্তে। আর তাঁর কবন্ধের রুধির ধারা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হল। দুটি ধারা দুই সখী পান করতে লাগলেন এবং তৃতীয় ধারা দেবী নিজে পান করলেন। মস্তক ছিন্না দেবীর নাম হল ছিন্নমস্তা। ছিন্নমস্তার আধ্যাত্মিক স্বরূপ অত্যন্ত মাহাত্মপূর্ণ। ছিন্ন যজ্ঞশীর্ষের প্রতীক এই দেবী শ্বেত পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা। পদতলে মদন ও রতি। শ্বেতপদ্ম বিশ্ব প্রপঞ্চ এবং মদন ও রতি চিদানন্দের স্থূলবৃত্তির প্রতীক। চতুর্দিক তাঁর বসন। দুই পার্শ্বে দুই সখী রজঃ ও তমো গুণের প্রতীক। তিনি নিজ মস্তক ছিন্ন করেও রক্তপানে সক্ষম অর্থাৎ প্রাণের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এটি সাধকের অন্তরমুখী সাধনা বা আমিত্ব লোপের পথ নির্দেশ করে। 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। যোগশাস্ত্রে উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থি অর্থাৎ ব্রহ্ম গ্রন্থি, বিষ্ণু গ্রন্থি ও রুদ্র গ্রন্থি ভেদ করলে সাধক অদ্বৈতানন্দ প্রাপ্ত হয়। মানব দেহের মূলাধারে ব্রহ্ম গ্রন্থি মণিপুরে বিষ্ণু গ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্র গ্রন্থির অধিষ্ঠান। শ্রীভৈরবতন্ত্র অনুসারে মণিপুর চক্রের নীচের নাড়ীতেই কাম ও রতির মূল এবং তার উপর ছিন্না মহাশক্তি আরূঢ়া। এই মহাশক্তির উর্দ্ধপ্রবাহ হলেই রুদ্র গ্রন্থি ভেদ হয়। হিরণ্যকশিপু, বৈরোচন প্রভৃতি সকলে ছিন্নমস্তার উপাসক ছিলেন। এজন্য দেবীর অপর নাম 'বজ্র বৈরোচনী'। অপরদিকে 'বজ্র বৈরোচনী' নামটি ব্যাখ্যা করলে পাওয়া যায় যে অগ্নির একনাম বৈরোচন। মণিপুর বা বিষ্ণু গ্রন্থিতে বৈরোচন বা অগ্নির অধিষ্ঠান। এই মণিপুরে ছিন্নমস্তার ধ্যান করলে বজ্র নাড়ীতে এর প্রবাহ হলে এঁকে বজ্র বৈরোচনী বলা হয়। এই উর্দ্ধমুখী প্রবাহ ক্রমে রুদ্র গ্রন্থি ভেদ করে

এবং সাধককে জীবভাব থেকে শিবভাবে উত্তীর্ণ করে।

দেবী **'ধূমাবতীর'** আবির্ভাব কাহিনীতে বলা হয়েছে যে একবার ভগবতী পার্বতী মহাদেবের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে বসে ছিলেন। দেবী ক্ষুধায় কাতর হয়ে শঙ্করের কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু কয়েকবার অনুরোধ করার পরেও শিব সে প্রার্থনা গ্রাহ্য না করায় দেবী কুপিতা হয়ে মহাদেবকেই গিলে ফেললেন এবং তাঁর শরীর থেকে বিপুল ধূম নির্গত হতে থাকে। দেবীর সুন্দর দেহ ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় তিনি ধূমাবতী বা ধূম্রা নামে পরিচিতা হলেন। ধূমাবতী মহাশক্তি, একাকী ও স্বয়ং নিয়ন্ত্রিতা। তাঁর কোন স্বামী বা প্রভু নেই। নিজের স্বামী মহাদেবকে গিলে ফেলায় দেবীকে বিধবা বলা হয়। ধ্যেয় রূপে ইনি বিবর্ণা, চঞ্চলা, ধূম্র বর্ণা, অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিহিতা, মুক্তকেশী, বিধবা, কাকধ্বজ চিহ্নিত রথারূঢ়া, হাতে কুলা, ক্ষুধা-পিপাসায় ব্যাকুল মুখ ও চক্ষুদ্বয় নির্মম দৃষ্টি সম্পন্ন। স্বতন্ত্র তন্ত্র অনুসারে সতীদেবী যখন দক্ষযজ্ঞে যোগাগ্নিতে নিজেকে ভস্মীভূত করেছিলেন, তখন সেই অগ্নি থেকে যে ধূম নির্গত হয়েছিল, তার থেকেই ধূমাবতী প্রকটিতা হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীচন্ডীতে বাভ্রবী ও তামসী নামে যে বর্ণনা আছে সেখানে বলা হয়েছে যে দেবী ধূমাবতী তুষ্টা হলে বিপত্তি নাশ ও সম্পত্তি প্রাপ্তি হয়। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তে দেবী 'সুতরা' নামে উল্লেখিত। সুতরার অর্থ সুখ পূর্বক তারণের উপযুক্ত। আগমশাস্ত্র অনুসারে ইনি অভাব ও সঙ্কট নাশ করে সুখদায়িনী বিভূতিরূপা। ধূমাবতী স্থির প্রজ্ঞের প্রতীক। এঁর রথের কাকধ্বজা বাসনাগ্রস্থ মনের প্রতীক, যা সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে। এঁর মলিন বিষন্ন রূপ জীবের দীন অবস্থা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কলহ, দারিদ্র প্রভৃতিকে প্রকাশ করে। আবার বেদের শব্দাবলীতে ধূমাবতী হলেন বৃত্রাসুর প্রভৃতি অসুরের মাতা কদ্রু।

মা **'বগলামুখী'** হলেন ব্যষ্টিরূপে শত্রুনাশের ইচ্ছাযুক্তা ও সমষ্টিরূপে পরমাত্মার সংহার শক্তি। পীতাম্বরা বিদ্যা নামে খ্যাত বগলামুখীর আরাধনা করা হয় শত্রুভয়মুক্তি ও বাক্‌সিদ্ধি লাভের জন্য। হরিদ্রা মালা, পীত পুষ্প ও পীত বস্ত্র সহযোগে এঁর পূজা বিধেয়। মঙ্গলবার চতুর্দশীর মধ্যরাত্রে এঁর আবির্ভাব। দৈবী প্রকোপ শান্তি, ধনলাভ প্রভৃতির উদ্দেশ্য নিয়ে বগলার পূজা করা হয়। তবে এঁর পূজায় ভোগ এবং মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায়। বগলা মাতার পরিধানে পীতবস্ত্র, পীত ভূষণে তিনি অলংকৃত এবং কণ্ঠে পীত পুষ্প

মালা শোভিত। তাঁর এক হস্তে শত্রুর জিহ্বা আকর্ষিত ও অন্য হস্তে গদা। বগলার ধ্যানে বলা হয় যে তিনি সুধা সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত মণিময় মণ্ডপে রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্টা। স্বতন্ত্র তন্ত্রে তাঁর আবির্ভাবের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে সত্যযুগে একবার সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য এক প্রলয়ংকরী ঝড় উঠেছিল। সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখে ভগবান বিষ্ণু সেই ঝড়কে প্রশমিত করতে সৌরাষ্ট্রদেশে হরিদ্রা সরোবরে গিয়ে ভগবতীকে প্রসন্ন করার জন্য তপস্যা শুরু করেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শ্রীবিদ্যা ওই সরোবরে বগলামুখী রূপে আবির্ভূতা হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই বিশ্বধ্বংশকারী ঝড়কে রোধ করলেন। বগলামুখী মহাবিদ্যা ভগবান বিষ্ণুর তেজের সঙ্গে মিলিত হয়ে হলেন বৈষ্ণবী। শ্রীবগলামুখীকে ব্রহ্মাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়। ঐহিক বা পারলৌকিক, দেশ অথবা সমাজে দুঃখদায়ী অরিষ্টাদিকে দমন করার জন্য ও শত্রুনাশের জন্য বগলামুখী মন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ। কুব্জিকা তন্ত্রে বগলামুখী জপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলা হয়েছে বগলামুখীর সিদ্ধিলাভের জন্য নক্ষত্রাদি বিচার বা কালশোধনের প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মা প্রথম এই বিদ্যার উপদেশ দেন সনকাদি মুনিদের। এরপর সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ও নারদ সাংখ্যায়ণ নামক পরমহংসকে এই জ্ঞানের উপদেশ দেন। সাংখ্যায়ণ ছত্রিশ খণ্ডে বিস্তৃত বগলাতন্ত্র রচনা করেন। বগলামুখীর দ্বিতীয় উপাসক শ্রীবিষ্ণু এবং তৃতীয় উপাসক পরশুরাম। পরশুরাম এই বিদ্যা আচার্য দ্রোণকে উপদেশ করেন।

শিবের আরেক নাম মতঙ্গ এবং তাঁর শক্তি 'মাতঙ্গী' নামে খ্যাত। নারদ পঞ্চরাত্রের দ্বাদশ অধ্যায় শিবকে চন্ডাল ও শিবানীকে উচ্ছিষ্ট চণ্ডালী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই চণ্ডালী হলেন মাতঙ্গী। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে একবার মতঙ্গ ঋষি সমস্ত প্রাণীকে বশ করার জন্য নানা বৃক্ষশোভিত কদম্ববনে ভগবতী ত্রিপুরা দেবীর কৃপা লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই সময় ত্রিপুরা দেবীর নেত্র থেকে উৎপন্ন তেজঃপুঞ্জ এক শ্যামলা নারী বিগ্রহের রূপ ধারণ করে। ইনি হলেন রাজমাতঙ্গী। মাতঙ্গী দেবী নানা নামে ভূষিতা, যেমন – রাজমাতঙ্গী, সুমুখী, বশ্যমাতঙ্গী, কর্ণমাতঙ্গী ইত্যাদি। মাতঙ্গীর ভৈরবের নাম 'মতঙ্গ'। ব্রহ্মযামল তন্ত্রে ঐকে মতঙ্গ মুনির কন্যা বলা হয়েছে। শ্রীশ্রী চন্ডীর সপ্তম অধ্যায়ে মাতঙ্গীর ধ্যানে বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি রত্নময় সিংহাসনে বসে কাকাতুয়ার মধুর কাকলি শুনছেন। তিনি শ্যামবর্ণা।

তাঁর একটি চরণ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বিদ্যমান। তাঁর শিরে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, কণ্ঠে কল্হার ফুলের মালা। বীণা বাদনরতা দেবী মাতঙ্গীর পরিধানে সুবদ্ধ চোলি শোভিত রক্তবর্ণ শাড়ী। তাঁর হস্তে শঙ্খপাত্র, মুখমণ্ডলে মধুপাণের মৃদু আভা এবং ললাটে সুন্দর টিপ। এই বর্ণনার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় – এঁর বীণার ঝংকার নাদের প্রতীক। কাকাতুয়ার কণ্ঠস্বর 'হ্রীং' বর্ণের উচ্চারণ, বীজমন্ত্রের প্রতীক। পদ্মফুল বর্ণাত্মক সৃষ্টির প্রতীক। শঙ্খ পাত্র হল ব্রহ্মরন্ধ্র ও মধু অমৃতের প্রতীক। রক্তবর্ণ শাড়ী অগ্নি বা জ্ঞানের প্রতীক। তাঁর শ্যামবর্ণ হল পরাবাক্ বিন্দু, ত্রিনয়ন সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির প্রতীক। তাঁর চার বাহু চারটি বেদ। তাঁর সিংহাসন শিবাত্মক মহামঞ্চ বা ত্রিকোণ। ইনি পূর্ণ বাক্‌দেবতার মূর্তি। মাতঙ্গীর উপাসনা করা হয় বাক্‌সিদ্ধির জন্য। তিনি অসুরদের মোহিতকারিণী ও ভক্তদের অভীষ্ট ফলদায়িনী। গৃহস্থ জীবনে সুখদায়িনী। পুরুষার্থসিদ্ধি ও বাক্‌বিলাসে পারঙ্গম হওয়ার জন্য মাতঙ্গীর সাধনা শ্রেয়। যিনি তান্ত্রিকদের মাতঙ্গী, তিনিই বৈদিকদের সরস্বতী। তন্ত্রশাস্ত্রে এঁর পূজার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

অমৃতলাভের উদ্দেশ্যে দেবতা ও অসুরেরা যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন তখন সমুদ্রগর্ভ থেকে যিনি উত্তিষ্ঠিতা হয়েছিলেন তিনিই 'কমলা' বা লক্ষ্মী নামে পূজিতা। ভগবান বিষ্ণুকে ইনি পতি রূপে বরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের, অষ্টম অধ্যায়ে কমলার আবির্ভাবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ভগবতী কমলা হলেন একাধারে বৈষ্ণবী শক্তি ও ভগবান বিষ্ণুর লীলা সহচরী। এঁর পূজা জগত-আধার শক্তির পূজা। দেবতা, মানব, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব সকলেই দেবী কমলার কৃপা পাবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। তাই আগম ও নিগম দুই শাস্ত্রেই এঁর পূজা সমানভাবে বর্ণিত। দেবী কমলার ধ্যানমন্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী ইনি সুবর্ণকান্তি এবং কমলাসনে উপবিষ্টা। এঁর মস্তকে মুকুট ও পরিধানে রেশমীবস্ত্র সুশোভিত। এঁর দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা এবং অপর দুই হাতে পদ্মফুল। হিমালয় সদৃশ চারটি শ্বেতহস্তী চারটি সুবর্ণ কলস শুণ্ডে জড়িয়ে দেবীকে স্নান করাচ্ছে। সমৃদ্ধির প্রতীক মা কমলার পূজা স্থির লক্ষ্মী প্রাপ্তি ও স্ত্রীপুত্রাদি সুখের জন্য করা হয়। ইনি ভার্গবদের পূজিতা বলে এঁর আরেক নাম 'ভার্গবী'। আদি শঙ্করাচার্য বিরচিত কনকধারা স্তোত্র ও শ্রীসূক্তের পাঠ, পদ্মবীজের মালায় শ্রীমন্ত্রের জপ, বিল্বপত্র ও বিল্বফলের দ্বারা যজ্ঞ করলে মা কমলার কৃপা লাভ করা যায়। স্বতন্ত্র তন্ত্র

অনুসারে কোলাসুরকে বধ করার উদ্দেশ্যে দেবী কমলার আবির্ভাব হয়। বারাহীতন্ত্র মতে পুরাকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এঁর পূজা করায় কমলার আর এক নাম ত্রিপুরা। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে শিব স্বেচ্ছায় ত্রিধাবিভক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ঊর্দ্ধভাগ গৌরবর্ণ, চতুর্ভূজ, চতুর্মুখ, ব্রহ্মা নামে পরিচিত হয়। তাঁর মধ্যভাগ নীলবর্ণ, একমুখ, চতুর্ভূজ, বিষ্ণু নামে পরিচিত হয় এবং অধোভাগ স্ফটিক বর্ণ, পঞ্চমুখ, চতুর্ভূজ, শিব নামে পরিচিত হয়। এই ত্রিধাবিভক্ত শিবকে বলা হয় ত্রিপুর এবং তাঁর শক্তি কমলা হলেন ত্রিপুরা। চিন্তামণি গৃহে এঁর বাস। ভৈরবযামল তথা শক্তিলহরীতে এঁর রূপ ও পূজাপদ্ধতি বর্ণিত আছে। এঁর পূজায় সকল রকম সিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে কালী থেকে কমলা — এই দশটি মহাবিদ্যা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হলেও সূক্ষ্মরূপে এঁরা পরমাত্মার একই শক্তি। দশমহাবিদ্যার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে হলে সমর্থ গুরুর নির্দেশিত সাধনপথ অবলম্বন করতে হবে।

নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি হলেন মহামায়া। তাঁর শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া ও প্রকাশকে এক একটি বিদ্যা বলা হয়। দেবীর দশপ্রকার বিদ্যার সমন্বয়কে এক কথায় বলা হয় দশমহাবিদ্যা। কালিকাপুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র, শ্রীশ্রী চন্ডী, বৃহন্নীল তন্ত্র, ব্রহ্মযামল প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থে দশমহাবিদ্যার এক একটি রূপ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ও সাধন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই সকল শাস্ত্র বীরাচারী তন্ত্র সাধকদের সাধন পথের আলোকবর্তিকা। তবে সমগ্র ভারতবর্ষে দশমহাবিদ্যার মন্দিরের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

কালী-তারা-মহাবিদ্যা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী-ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধিবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধ বিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।।

মহামায়ার যে রূপ দর্শনে স্বয়ং মহাদেব স্থির থাকতে পারেননি সেই রূপের দর্শন যে সকল সাধকের জন্য অনুমোদিত নয় একথা বলাই বাহুল্য।

তাই দশমহাবিদ্যার সাধন তত্ত্ব অতি গুহ্য এবং কেবলমাত্র অধিকারী সাধকই তাঁর গুরু কর্তৃক নির্দেশিত পথে বীরাচারে সেই সাধনা করতে পারেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দশমহাবিদ্যা রূপ দর্শনে ধন্য হয়েছেন এমন সাধকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ঠাকুর সর্বানন্দ।

বর্তমান বাংলাদেশের মেহের নামক গ্রামে এক পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর সর্বানন্দ। তাঁর পিতা ও অগ্রজেরা ছিলেন গ্রামের জমিদারের বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত পণ্ডিত। জমিদারের বাড়ি তাঁরা প্রতিদিন উপস্থিত হয়ে নানা বিষয়ে বিধান দিতেন। এ হেন পরিবারের সন্তান সর্বানন্দ কিন্তু শৈশব থেকেই ছিলেন আত্মভোলা ও একেবারেই মূর্খ। পুঁথিগত বিদ্যায় তাঁর মন ছিল না। সারাদিন শ্মশানে বা জঙ্গলে নিজের মনেই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সর্বক্ষণের পাহারাদার ছিল তাঁদের পরিবারের এক প্রবীণ ভৃত্য। একদিন তাঁর পিতা ও অগ্রজরা জমিদার বাড়িতে না যেতে পারায় তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে তরুণ সর্বানন্দ জমিদারের সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর রূপের আকর্ষণে উপস্থিত অনেকেই মুগ্ধ হলেও কয়েকজন তাঁর মূর্খতা নিয়ে পরিহাস করতে উৎসাহী হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সর্বানন্দের কাছে জানতে চাইলেন সেদিন কোন তিথি। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই সর্বানন্দ উত্তর দিলেন – 'পূর্ণিমা'। হাসির রোল উঠল সভাকক্ষে। কারণ সেদিন ছিল অমাবস্যা। জমিদার স্বয়ং ক্ষুব্ধ হয়ে সর্বানন্দকে পণ্ডিতঘরের মূর্খ বলে তিরস্কার করলেন। উপস্থিত অন্যান্য চাটুকাররা জমিদারের কথার সমর্থনে তাঁকে নানা অপমানব্যঞ্জক কথা উপহার দিলেন। সকলের নিন্দাবাক্যে জর্জরিত সর্বানন্দ তীব্র অপমানবোধে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। সেদিন ছিল মকর সংক্রান্তি। তখন অপরাহ্ন শেষে সন্ধ্যা আগত। সর্বানন্দ নদীর জলে স্নান করে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হলে এক মহাসাধক সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। সেই মহাসাধকের নির্দেশে সর্বানন্দ শ্মশানের এক পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে সাধনায় বসলেন। বীরাচারে সাধনার সকল উপকরণ আয়োজিত হল। তাঁকে সাহায্য করলেন তাঁর সেই প্রবীণ ভৃত্য। রাত্রি দ্বিতীয় যামে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন সর্বানন্দ। দেবী প্রকটিত হয়ে তাঁর প্রার্থনা জানতে চাইলেন। সর্বানন্দের পরিবর্তে তাঁর ভৃত্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন যে, যেহেতু সেদিন অমাবস্যায় পূর্ণিমা বলে সর্বানন্দ সকলের কাছে অপমানিত হয়েছেন, তাই দেবী যেন কৃপা করে সেই মধ্যরাত্রে আকাশে চন্দ্রালোক

বিচ্ছুরিত করেন। দেবীর প্রসাদে তাঁর নখাগ্র থেকে উদ্ভূত কিরণ ছটার সেই মধ্যরাত্রে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সেই কিরণছটাকে চন্দ্রকিরণ মনে করে সমগ্র মেহেরবাসী অবাক হয়ে গেল। সর্বানন্দের মুখনিঃসৃত কথাকে সত্যে পরিণত করার জন্য দৈবী কৃপায় অমাবস্যায় চাঁদের কিরণ দেখে মেহেরবাসী সর্বানন্দের নামে ধন্য ধন্য করতে থাকে। প্রথম পার্থনা পূরণ হওয়ায় সর্বানন্দ ও তাঁর ভৃত্যের আনন্দ আর ধরে না। তখন তার ভৃত্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন ভগবতীর দশমহাবিদ্যা রূপ দর্শনের জন্য। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা মা প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ শিব যে রূপ দর্শন করে স্থির থাকতে পারেননি, মানুষের পক্ষে সেই রূপের দর্শন অনুমোদিত হতে পারে না। কিন্তু সর্বানন্দ ও তাঁর ভৃত্যের ব্যাকুল প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত মহামায়ার দশমহাবিদ্যা রূপ প্রকটিত হল। এক একটি রূপ দর্শনমাত্র সর্বানন্দের কণ্ঠ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেইরূপের সুমধুর বর্ণনাশ্লোক উৎসারিত হতে লাগল। একে একে সব রূপ দর্শন করে পরিপূর্ণ হৃদয়ে সর্বানন্দ উষালগ্নে গ্রামে ফিরলেন। মধ্যরাত্রে চাঁদের কিরণ উদিত হওয়ায় মূর্খ হাস্যস্পদ সর্বানন্দ ততক্ষণে গ্রামবাসীর কাছে ঠাকুর সর্বানন্দে পরিণত হয়েছেন। স্বয়ং জমিদার তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ঠাকুর সর্বানন্দের নির্দেশে তাঁর কণ্ঠোৎসারিত দশমহাবিদ্যার ধ্যান মন্ত্র গুহ্য রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকৃত অধিকারী সাধকদের কাছেই এই মন্ত্র উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। মেহের গ্রামে ঠাকুর সর্বানন্দ প্রতিষ্ঠিত দশমহাবিদ্যার মন্দিরে নিত্য সেবা আজও অব্যাহত।

আরও দুইজন সাধক মায়ের দশমহাবিদ্যা রূপ দর্শন করেছিলেন। তাঁরা হলেন কালিঘাটের মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠাতা - সাধক ব্রহ্মানন্দ ও আত্মারাম। মায়ের দর্শন লাভের জন্য সাধক ব্রহ্মানন্দ নীলগিরি পর্বতের গুহায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহামায়া এক বড় শিলাখণ্ডে অবস্থান করতে লাগলেন গৌরী রূপে। এদিকে, বাংলার এক মহান সাধক আত্মারামকে মা স্বপ্নে জানালেন শিলারূপে সতীর পদাঙ্গুলীর সন্ধান। সেই আদেশ মতো তিনি কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। আত্মারামের সাধনায় মা আর নীলগিরি পর্বতে স্থির থাকতে পারলেন না। এক প্রবল বন্যার জলে মা তাঁর শিলাখন্ড এবং ব্রহ্মানন্দকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে এলেন আত্মারামের কাছে। মায়ের আদেশে ভেসে আসা শিলাখন্ডে আত্মারাম নির্মাণ করলেন মাতৃমূর্তি, এখানেই তাঁরা দশমহাবিদ্যার দশটি রূপ দর্শন করেছিলেন।

বর্তমানে বর্তমান

মন্দিরে স্থায়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার পর থেকে মায়ের নিত্যসেবার যে প্রাত্যহিকী বর্তমান আছে তা হল উষাকালে মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে মায়ের জাগরণ, মধ্যাহ্নে পূজা ও ভোগ নিবেদন এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর শয়ন। অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা অন্যান্য বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। বিশেষ উপাচারে বিশেষ পূজায় সময়ের নির্ঘন্ট পরিবর্তিত হয়ে যায়। বহু ভক্ত সমাগমে ঐ বিশেষ দিনগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

দশমহাবিদ্যার গূহ্য তত্ত্ব বা পূজা পদ্ধতির বাইরে এক অতি আন্তরিক নিয়ম নিষ্ঠায় মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যখনই কোন ত্রুটি ঘটে তখনই মা যে কোন ভাবেই তা জানিয়ে দেন। ফলে এই পূজা পদ্ধতি নিয়ে আমরা কখনই গবেষণা করি না। ফলে আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও মা সদাসর্বদা নজর রাখেন আমাদের প্রতিটি কাজে। বর্তমানে ভক্তদের আগমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ এই স্থানে মায়ের কৃপার বাতাস বইছে। যে পাল তুলে দেয় সেই অনুভব করে বাতাসের স্পর্শ। পাল তোলার অর্থ ব্যাকুলতা। ব্যাকুল হয়ে মাকে ডাকলে মা অবশ্যই সাড়া দেন। যাঁরা তাঁর সাড়া পেয়ে ধন্য হয়েছেন তাঁরা অবশ্যই একথা অনুমোদন করবেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতো সাধারণ সংসারী মানুষ অনেক সময় মায়ের কাছে প্রার্থনা করেও সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি না। সেই প্রার্থনা পূরণের জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করি। ফলে অনেক সময় ফলাফল আমাদের মনমতো হয় না। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে। একবার এক সাপ ক্ষুধায় কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল তাকে একটা ব্যাঙ দেবার জন্য। তার কাতর প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হয়ে একটা ব্যাঙকে পাঠিয়ে দিলেন সাপের কাছে। আর সাপকে বললেন — 'লাফাও আর খাও'। ভগবানের কাছে আদিষ্ট হয়ে নিরুপায় ব্যাঙটি সাপের কাছে যাবার আগে ভগবানকে বলল - 'হে ভগবান, আমি কি দোষ করেছি যে তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে। তোমার এক সন্তানের কাতর প্রার্থনায় তুমি বিচলিত হলে, কিন্তু আমি কি তোমার সন্তান নই? তাহলে আমায় প্রাণদানের আদেশ করলে কেন?' তখন ভগবান ব্যাঙের

অবস্থা অনুধাবন করে তাকে বললেন — 'তুই মরার মতো পড়ে থাকবি।' ভগবানের উপদেশ মতো ব্যাঙ পথের ধারে মরার মতো পড়ে রইল। সাপ সেখানে এসে প্রথমে ব্যাঙকে দেখে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর ফণা তুলে ছোবল দেবার আগে তার মনে হল ব্যাঙটা মরা। মরা ব্যাঙ দেবার জন্য সে ভগবানকে দোষারোপ করতে করতে মনের দুঃখে ফিরে গেল ভগবানের কাছে। ইতিমধ্যে ব্যাঙও উঠে উধাও হয়ে গেল। ভগবানের কাছে অভিযোগ করে সাপ বলল — 'হে ভগবান, আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে একটা ব্যাঙ প্রার্থনা করেছিলাম। তুমি আমাকে একটা মরা ব্যাঙ উপহার দিলে? তুমি তো জানো আমি মরা ব্যাঙ খাই না।' ভগবান বললেন — 'হে সাপ, তুমি আমার কাছে যখন প্রার্থনা করেছিলে, তখন আমি তোমাকে উপদেশ দিয়েছিলাম 'লাফাও আর খাও'। কিন্তু তুমি ফণা তুলেও নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত করলে যে ব্যাঙটি মরা। ফলে তাকে না খেয়ে তুমি চলে এলে। তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারোনি। ফলে নিজের কৃতকর্মের ফল লাভ করেছ। কিন্তু ব্যাঙকে বলেছিলাম মরার মতো পড়ে থাকতে। সে আমার উপদেশের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে তোমার উদ্যত ফণার সামনেও একইভাবে পড়েছিল। ফলে সে তার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করল।'

প্রকৃতপক্ষে গল্পের ব্যাঙের মতো শরণাগতি আমাদের থাকলে আমরাও প্রতিটি ক্ষেত্রে মায়ের কৃপা অনুভব করতে পারি। তাঁর হাতের ক্রীড়নক হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় সংসারে ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মতো পড়ে থাকা দরকার। তাহলেই একদিন আমাদের অন্তরে মায়ের উপস্থিতি আমাদের অনুভবে ধরা দেবে।

মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী

শিবপুর বিজয়ী সংঘ পরিচালিত শ্রীশ্রী৺দশমহাবিদ্যা মন্দিরের মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী হয়ে ওঠার কাহিনী ও দশমহাবিদ্যা রূপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্বলিত ইতিহাস।

শিবপুর বিজয়ী সংঘ (রেজি: এস্/৯৫৯৭৪)
৬, ভূতনাথ হালদার লেন, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২
website: http://www.dashmahavidyatemple.in